খেয়াল খুশি

পুজো সংখ্যা ১৪৩১

আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার
বুক করে দুরু দুরু।
পেয়েছে খবর, পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।

ভ'রে এল,
টিল মেলা।
খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া।
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।

একটি Zeal & Notion উদ্যোগ

খেয়াল-খুশি

পুজো সংখ্যা ১৪৩১

আলাপ পর্ব

সম্পাদনায় **মেঘা সিনহা**
সহ-সম্পাদনায় **স্বপ্নীল ও বনি সেনগুপ্ত**
বর্ণবিন্যাসে **স্বপ্নীল**
প্রচ্ছদ অঙ্কনে **প্রীতম চক্রবর্তী**
শিল্প নির্দেশনায় **সায়ন্তী সরকার**
অর্থসচিব **পিঙ্কি চক্রবর্তী**

পরিবারের বাকিরা - শুভম বোস, সৃষ্টি ব্যানার্জি বোস, হৈমন্তী ভট্টাচার্য, সায়ন্তী সরকার, তৃষিতা সরকার, সহেলী সরকার, দীপ্তি সিংহ, সৌমেন অধিকারী, বনি সেনগুপ্ত, কৌণিক দে, পূবালী ভট্টাচার্য, অদ্রিজা কুন্ডু, সঙ্গীতা দাস

Zeal & Notion -এর পক্ষ থেকে মৈনাক সিনহা কর্তৃক প্রকাশিত।

যোগাযোগ :
খেয়াল খুশি
জয়নগর মজিলপুর বোস পাড়া
ডাকঘর- জয়নগর মজিলপুর
থানা- জয়নগর
সূচক- ৭৪৩৩৩৭
দূরাভাষ- ৭৯০৮৩৪৪২৬৬/ ৭৫৮৫০৯৮১২২
মেইল- zealnotion@gmail.com

Zeal & Notion- খেয়ালখুশি
মুদ্রণ:
নস্কর অফসেট
৫/১ রামনাথ বিশ্বাস লেন
বৈঠকখানা বাজার
কলকাতা- ৯

বিনিময়- ~~৬০~~ ৫০ টাকা মাত্র

Zeal & Notion
Be all that you can be

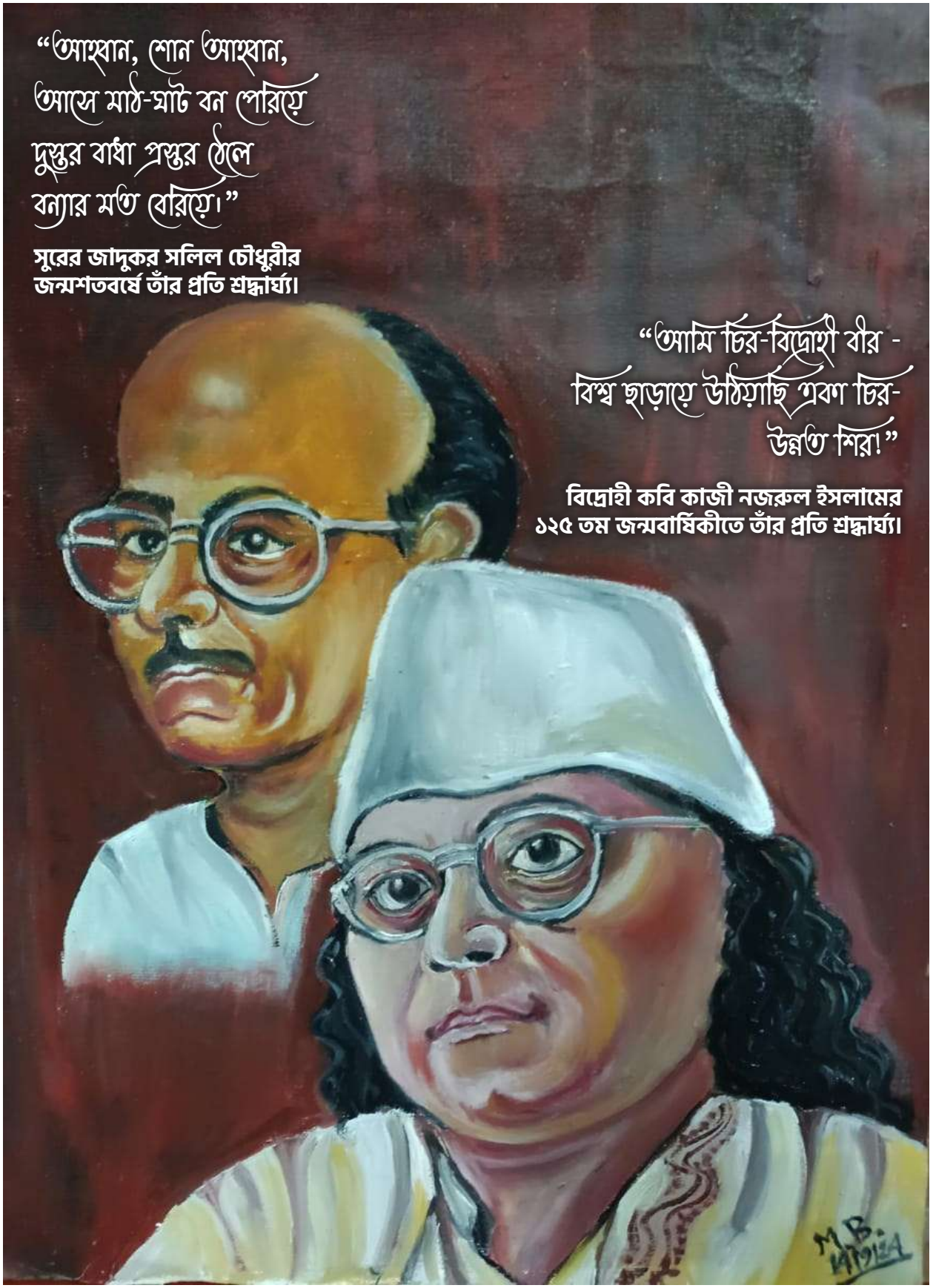
"আহ্বান, শোন আহ্বান,
আসে মাঠ-ঘাট বন পেরিয়ে
দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে
বন্যার মত বেরিয়ে।"
সুরের জাদুকর সলিল চৌধুরীর
জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।
"আমি চির-বিদ্রোহী বীর -
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-
উন্নত শির!"
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের
১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

Associated with

UdayPad

LINCOLN ACADEMY

CogNize UTRITION

COMMUNITY NUTRITION
CORE GROUP IAPEN INDIA

কলা মন্দির
(স্থাপিত - ১৯৮৮)

FUTURE BEGINS WITH US

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২

ফিচার ৩ – ৮

দুগ্গা - দুগ্গা

তৃষিতা সরকার, সায়ন্তী সরকার,
সহেলী সরকার, দীপ্তি সিংহ, সৌমেন অধিকারী

প্রবন্ধ ৯ –১৪

গাজনের ইতিবৃত্ত – ড. তরুণ কুমার দাস
দেশ-বিদেশে সংস্কৃত চর্চা – পিঙ্কি চক্রবর্তী
আজকের শিশুরা কি যান্ত্রিক?– শম্পা সিনহা

খোশ গল্প ১৫ – ২০

গৌরী এলো –পূর্বা সরকার,
আমি দুর্গা, আমি পরিতক্তা – সুচরিতা দত্ত,
অকালবোধন –স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, গোল – সম্প্রীতি দে

খেলার ছলে ২১

শব্দবাণ, সুদোকু, তফাৎ চেনো, ছবি দেখে শব্দ লেখো,
খেলার ছলে অঙ্ক, খেলার ছলে অঙ্ক কষো

হাতে গড়া ২২

জিভ বের করা কোলাব্যাঙ

ফ্রেমবন্দি ২৩

অন্বেষা ঘোষ – প্রস্ফুটিত, অদ্রিজা কুন্ডু –রাঙা আলোয়
সায়ন্তী সরকার – দোসর, আনোয়ার সেখ– প্রেয়সী,
কৌণিক দে – দুচোখে তার পান্না বাহার,
সম্প্রীতি দে – রৌদ্রস্নাত, সাহিত্য মন্ডল – শিকার
শুভ্রতনু সরকার – শহর জুড়ে যেন প্রেমের মরশুম
নভনীল নিয়োগী – কুয়াশাবৃত কল্লোলিনী

খুদেদের ক্যানভাস ২৪ – ২৫

স্নেহা ভট্টাচার্য্য, সৃণিকা চক্রবর্তী, সার্থক পুরকাইত, সাদ্রিতা পাল,
শ্রীয়াংশু দাশগুপ্ত, শ্রীয়া পাল, শ্রীনিকা বোস, শুভাঙ্গী মুখার্জী,
বিদিশা হালদার, প্রাভিকা চক্রবর্তী, পৃথিকা চক্রবর্তী,
ঈশাঙ্ক সরকার, জয়স্মিতা নন্দী, ইহিতা সরকার, ইভানা
সরকার,আরোশী হালদার, অন্বিতা পুরকাইত, অনির্বান নস্কর,
বিনায়ক সরকার,

ছোটদের কথা ২৬ – ২৭

সৃনিকা চক্রবর্ত্তী, সাত্যকি ভট্টাচার্য, প্রাভিকা চক্রবর্তী,
পৃথিকা চক্রবর্তী, জয়স্মিতা নন্দী, ইহিতা সরকার

কমিক্স ২৮ – ৩০

দ্যা ক্যেমিলিয়ান স্টোন

ফুসমন্তর ৩১ – ৩২

সুন্দর ত্বকের রহস্য কথা - বনি সেনগুপ্ত

কবিতার ঝুলি ৩৩ – ৪২

লুণ্ঠিত শৈশব – তাপসী প্রামানিক, পুনর্জন্ম – শ্যামলী দত্ত,
তোরে নাহি দিব যেতে – স্বপ্না মুখার্জি,
তোমাকে কিছু বলবো বলে – কেতকী বসু,
আমি তোমার প্রেমিকা লিখছি – কৌশিকী ব্যানার্জি,
শারদীয়া – হৈমন্তী ভট্টাচার্য, পথভ্রষ্ট – প্রী ত ম,
শরৎ রানী – ডা. সমীর সিনহা,
নারী, তোমায় রক্ষা করতে নারি! – তৃষিতা সরকার,
আবদার – লিপি, উদ্দেশ্যহীন গন্তব্য – রী ত ম,
আপনি কে – অম্লান, সেই মেয়েটি – অমিত, যন্ত্রনা – প্রীতম মুখার্জি,
সেই মেয়েটা–সুকান্ত মন্ডল, অনন্ত কালের পথিক–বিন্দিয়া গোস্বামী

খোশ গল্প ৪৩ – ৫১

বৈতরণী পার –প্রীতিকণা দাস, দিগন্ত পারে –পল্লবী চক্রবর্তী

টাটকা–টাটকা ৫১

অলিম্পিক ২০২৪-এ ভারত - বনি সেনগুপ্ত

আঁকাঝোঁকা ৫২

পত্রিকা সহায়ক ৫৩ – ৫৪

খেলার ছলে উত্তর ৫৫

আজব ব্যাপার ৫৬

সম্পাদকীয়

একটা পত্রিকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত অংশ হচ্ছে 'সম্পাদকীয়' লেখার অংশটুকু। একজন পাঠক হাতে বই পাওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই সূচীপত্রের পাতায় চোখ বোলাতে শুরু করে দেয় নিমেষেই। কিন্তু উপায় নেই যে! নিয়ম তো নিয়ম-ই! তাই না? যাক, সেসব কথা বাদ থাক। আমাদের একটা সদ্য অঙ্কুরিত হওয়া দলের হঠাৎ করেই ইচ্ছে হল আমরা একটা পুজো সংখ্যা বের করবো। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। খেয়ালের বশে করলাম বলে পত্রিকার নাম দিয়ে ফেললাম 'খেয়ালখুশি'। আমাদের গতানুগতিকতা মোটেই পছন্দ না। তাই আমরা গতে বাঁধা ছোটো পত্রিকা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করার সাহস দেখিয়েছি।

আজকের এই রিলের দুনিয়ায় খুদেদের বই পড়ার অভ্যাসের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ছাড়লে তো চলবে না। অভ্যাস করানো তো আমাদেরই কর্তব্য। তাই অনেক জটিল আলোচনা, রাজনীতির গন্ডি পেরিয়ে আমরা চলে গেছি একদম খুদেদের রাজ্যে। যাদের হাতের আঁকিবুকিতে আমাদের পত্রিকার পাতা রঙিন হয়ে উঠেছে। যাদের মনের কথায় আমাদের মনেও জানান দিচ্ছে 'পুজো আসছে'। তাছাড়া বনেদি বাড়ির কিছু পুজো, প্রবন্ধ, টাটকা খবর, কমিক্স, খুদেদের বেশ কিছু খেলা আরও কত কিছু নিয়ে পত্রিকা ভরে উঠেছে। সেই সঙ্গে দক্ষ শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়েছে প্রচ্ছদ ও শ্রদ্ধার্ঘ্যের পাতাগুলো। এই ঋণ শোধ করার নয়। আমরা সত্যিই তাদের কাছে ঋণী। আমরা অল্প কিছুই চেয়েছিলাম। কিন্তু সবার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবেই এত কিছু পেয়ে যাওয়ার আনন্দটাই বারবার নতুন কিছু শুরু করতে বলে আমাদেরকে। তাই সবক্ষেত্রে বিদায়ের সময় কথাটা শোনা গেলেও, আমরা শুরুই করলাম 'দুগ্গা-দুগ্গা' বলে।

শারদ-শুভেচ্ছা

প্রকৃতির সাথে মানুষের মনের এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রকৃতির একেকটা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে মনও ঠিক জানতে পারে যে কী আসতে চলেছে। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ মাটি থেকে এখনও না গেলেও আমাদের নাকে কিন্তু শিউলি ফুলের গন্ধ এসেই গেছে। তাছাড়া শরৎ মেঘে রবীন্দ্রনাথকে দেখার সৌভাগ্যের দিন প্রায় শুরু হয়ে গেছে বললেই চলে। অফিস ফিরতি মানুষেরা সাবধানে এদিক ওদিক বর্ষার জমে থাকা জলকে সামলে ভিড় করছে গড়িয়া হাট কিংবা ধর্মতলায়। বাজারের থলে নিয়ে চায়ের দোকানে যাওয়া মধ্য বয়সী হোক কিংবা ষাটের বেশি বয়সী মানুষই হোক, তাদের একটাই আলোচনা 'পুজোর আর বেশি দিন নেই যে।'

'খেয়ালখুশি' পত্রিকাকে আমরা তেমনভাবেই পুজোর সাজে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। চা-এর কাপে চুমুক দিতে দিতে এই পত্রিকাকে হাতে তুলে নিলেই আপনার কাছে এক পুজোর মিষ্টি গন্ধ পৌঁছাবেই, এ আমরা কথা দিলাম। অকপটে স্বীকার করছি পত্রিকায় যা ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তার দায় আমাদেরই। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কোনো এক চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে হবে না হয়! আপাতত, টিম 'Zeal & Notion'- এর পক্ষ থেকে পাঠক ও খুদেদের জন্য আসন্ন শারদীয়ার এক আকাশ শুভেচ্ছা জানাই।

দুগ্গা দুগ্গা

দুর্গাপুজো যুগ যুগ ধরে বাঙালির গর্ব, অহংকার এবং ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ঢাকের কাঠি, কাশের দোলা ছাড়া বাঙালি জাতির বছর অসম্পূর্ণ। বর্তমানে দুর্গোৎসব বলতে বাঙালি বোঝে সর্বজনীন ও আধুনিক থিমের পুজো। কিন্তু যেসব পুজোর সূত্র ধরে আজ এত রমরমা তার খবর রাখে কজন! প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বনেদি বাড়ির পুজোগুলোই আজকের সর্বজনীন পুজোর ভীত গেঁথে গেছে। বনেদি বাড়িগুলির পুজোর প্রতিটি খড়ের বাঁধনে কত যে অজানা গাথা লুকিয়ে আছে তার সন্ধান অনেকেরই অজানা। তাই আমরা 'Zeal & Notion'-এর সদস্যরা একদিন বেরিয়ে পড়লাম জয়নগর মজিলপুরের বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী এবং শতাব্দী প্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজো সম্পর্কে জানতে, যেগুলি আজও স্বমহিমায় জ্বাজল্যমান।

দাশু মিত্রের বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের অন্তর্গত একটি সুপ্রাচীন পূজা হল মিত্রপাড়ার দাশু মিত্রের বাড়ির পূজা। আনুমানিক ১১৩৬ বঙ্গাব্দে এই পূজার সূচনা হয় বলে জানা যায়। এই পরিবারে ছয় থেকে সাত পুরুষ ধরে নিরঙ্কুশভাবে সমস্ত প্রাচীন রীতি মেনে মাতৃ আরাধনা চলে আসছে। জমিদার মহেশ মিত্রের স্ত্রী স্বপ্নে মাতৃ আরাধনার আদেশ পেলে জমিদারবাবু এই পূজার সূচনা করেন। প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে আপনাদের বলে রাখি, প্রতিবছর নতুন খড় দিয়েই দেবী মূর্তি তৈরি হয়। বর্তমানে গোপালনগরের শশধর পোটো বংশানুক্রমিকভাবে মৃন্ময়ী রূপ প্রদান করে চলেছেন। এই পরিবারে দেবী ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজে সজ্জিতা হন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকারে ভূষিতা হন। আমাদের প্রতিনিধি এবং শুভেন্দু মিত্রের কথোপকথনে উঠে আসে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য যা জানলে আপনারা বিস্মিত হবেন—

প্রশ্ন : এমন কোন প্রাচীন রীতি আছে কি যেটি আজও অক্ষুন্ন?

উত্তর : অবশ্যই। মহালয়ার আগে নবমী তিথিতে কল্পারম্ভের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয় এবং দীর্ঘ একমাস পর মহানবমী তিথিতে এর সমাপন হয়।

প্রশ্ন : প্রাচীন রীতির কথা যখন বলছেন তখন আপনাদের পরিবারে বলি প্রথার প্রচলনও আছে কি?

উত্তর : বাপরে! সে আর বলতে? আগে তো সাত-সাতটা পাঁঠা বলি হত, তবে এখন কমে সেটা দুটোয় ঠেকেছে। আর এই বলির মাংসই মহাপ্রসাদ হিসেবে মা-কে নিবেদন করা হয়।

প্রশ্ন : আপনাদের পরিবারে কোন দৈবিক যোগ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন ?

উত্তর: তা আছে বৈকি! আমরা তো জানি বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে এঁচোড় হয়। তবে আমাদের বাগানে আশ্চর্য রকম ভাবে মায়ের লীলায় এই আশ্বিনে একটি হলেও এঁচোড় হবেই এবং সেটা আমরা মাকে উৎসর্গ করি।

পরিশেষে উল্লেখ্য এই বাড়িতে গুপ্তপ্রেস মতে পুজো হয় এবং বিগত ৪০-৫০ বছর ধরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকারের পরিবার এই বাড়িতে পৌরোহিত্য করে আসছেন।

ঘোষ বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের উত্তর পাড়ার আরও একটি সুপ্রাচীন পুজো হল ঘোষ বাড়ির দুর্গাপূজা। এটি প্রায় ১৭০ বছর ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। স্বর্গীয় রাধারমন ঘোষ এই পুজোর সূচনা করেন এবং বর্তমানে তার পঞ্চম পুরুষ ব্রজকিশোর ঘোষ এই পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা। জন্মাষ্টমীর পরের দিন শাল কাঠের সুপ্রাচীন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়। মথুরাপুর নিবাসী নন্দলাল মন্ডল বংশানুক্রমিকভাবেই এই পুজোর মৃৎশিল্পের ভূমিকা অবলম্বন করেন। পূর্বে মাটির সাজে ভূষিতা হলেও বর্তমানে ডাকের সাজে দেবী সজ্জিতা হন। দেবীকে শুকনো চাল এবং ফল ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। পুরুষানুক্রমে মুখার্জি পরিবার এই পুজোয় পৌরোহিত্য করে আসছেন। বিগত কিছু বছর ব্যাপী শ্রীযুক্ত রাম মুখার্জি মহাশয় এই পুজোয় পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নির্বাহ করে চলেছেন।

সিদ্ধান্ত বাড়ি

মজিলপুরের সর্বপ্রাচীন সিদ্ধান্ত বাড়ির দুর্গাপূজার ইতিহাস জানলে আপনিও চমকিত হবেন। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষই হলেন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতের রচয়িতা। দীর্ঘ ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পরিবারে দেবীর আরাধনা হয়ে চলেছে। এই পরিবারের ইতিহাস দেখতে গেলে রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম উঠে আসে। ওনার মুন্সি চন্দ্রকেতু দত্ত মহাশয়-এর উত্তরসূরী রামচন্দ্র দত্ত মজিলপুরে সর্বপ্রথম জমিদারি পত্তন করেন এবং তার সাথে সর্বপ্রথম দেবী রক্ষাকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রামচন্দ্র দত্তের পরিবারের যজ্ঞের পুরোহিত শ্রীকান্ত উদগাতার হাত ধরেই এই পূজার শুভারম্ভ হয়।

এই পূজার ব্যাপারে পরিবারের সদস্য শরণ্য ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য উঠে আসে।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনাদের পদবী তো ভট্টাচার্য তাহলে 'উদগাতা' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'উদগাতা' আসলে একটা উপাধি, এর অর্থ যিনি উচ্চস্বরে বেদ পাঠ করতে পারেন।

প্রশ্ন: এই পুজোর বিশেষ কোনো রীতি বা নিয়ম আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ তা আছে বৈকি! অষ্টমীতে কাম্য পুজো হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: কাম্য পুজো? একটু বিশদে যদি বলেন।

উত্তর: যে সকল মহিলাদের মানত থাকে, তারা স্নানের পর শুদ্ধ থেকে হাতে মালসা নিয়ে ধুনো পোড়ান।

প্রশ্ন: বাহ! বেশ চমকপ্রদ একটা তথ্য। আর কোনো বিশেষত্ব?

উত্তর: উদগাতা পরিবার হিসাবে এই পুজোয় হোম বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। সপ্তমীতে হোমের শুভারম্ভ হয় এবং নবমীতে মহা হোম-এর মধ্য দিয়ে তার সমাপন ঘটে।

রথের দিন কাঠামো পুজো হয় এবং পঞ্চমীতে হয় দেবীর বোধন। অনুপম দাস বংশানুক্রমিক ভাবেই প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। পূর্বে মাটির সাজ থাকলেও বর্তমানকালে ডাকের সাজ হয়ে আসছে এবং প্রতিবছর ভিন্ন রঙের সাজে দেবীকে সজ্জিতা করা হয়। ধারাবাহিকভাবে এই পরিবারের সদস্যরাই পৌরোহিত্যের ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই পুজোয় একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই আমরা। মাছ ও চিংড়ি সহযোগে এখানে দেবীর ভোগ নিবেদন করা হয়।

সাদা দত্ত বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের সর্বপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির মধ্যে দত্ত বাড়ি অর্থাৎ সাদা দত্ত'র বাড়ির পুজো হল অন্যতম। প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মাতৃ বন্দনা করে আসছে এই দত্ত পরিবার। এই সুপ্রাচীন দুর্গাপূজার কথা জানতে গেলে উঠে আসে রানী রাসমণি'র প্রসঙ্গ। বাবু হালদারের কাছে এই পূজা পত্তনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন—

"জমিদার চন্দ্রকেতু দত্ত তার নাতির অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করেন রানী রাসমণিকে। রানী রাসমণি তখন উপহার বা যৌতুক স্বরূপ সুন্দরবনের অনেকাংশ দান করেন দত্ত পরিবারকে। তারপর থেকেই শুরু হয় দত্তদের জমিদারি এবং জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজা।"

অষ্টমীতে কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হয় পূজা প্রস্তুতি। তবে সাধারণভাবে নৈবেদ্য প্রদান করে পুজো শুরু হয় মহালয়ার প্রতিপদ থেকে এবং আড়ম্বরপূর্ণ পুজো শুরু হয় পঞ্চমী থেকে যা চলে দশমী পর্যন্ত। আরম্ভের প্রসঙ্গে বাবু হালদার জানান—

"আগের সময় জাঁকজমক ছিল বিরাট। আগে ছ-ফুটের তামার পাত্রে মাকে নৈবেদ্য দেওয়া হত। তার সাথে নতুন বস্ত্র বিতরণ তো ছিলই। তবে বর্তমানে এসব আর কিছুই নেই। আগে ২১ দফা বাসন ছিল। বর্তমানে যার কিছু কিছু থাকলেও সেই আড়ম্বর, জাঁকজমক সবই বিলুপ্ত।"

আগে দত্ত পরিবারের পুজোয় আখ ও কুমড়ো বলি হলেও বর্তমানে আখ সম্প্রদান করা হয়। সবশেষে যে কথা না বললেই নয়, দত্ত পরিবার পূর্বে পৌরসভাকে অনেক জমি দান করেছিল। বর্তমানে দত্ত পরিবারের পুজোর জৌলুষ কমে আসায় পৌরসভা দত্ত পরিবারের দুর্গাপুজোর দালান বাড়িটি নির্মাণ করে দেয়।"

সময়ের স্রোতে পুজোর আড়ম্বর ম্রিয়মাণ হলেও দত্ত পরিবার এবং দত্ত পরিবারের পূজার ঐতিহ্য জয়নগর মজিলপুরে আজও বর্তমান।

লাল দত্তের বাড়ি

এবার আসি সেই বাড়ির দুর্গাপুজোয় যে বাড়ির বন্দুকের আওয়াজে সারা মজিলপুরে সন্ধিপুজো শুরু হত। বুঝতেই পারছেন, আমরা বলছি মজিলপুর দত্তপাড়ার সুপ্রাচীন লাল দত্ত বাড়ির পূজা সম্পর্কে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ দত্ত মহাশয় স্বপ্নাদেশ পেলে তাঁর হাত ধরে এই পূজার সূচনা হয় এবং তখন থেকেই দীর্ঘ ১৩৫ বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে এই পূজা চলে আসছে। এই পূজা সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে শ্রদ্ধেয় কল্যাণ দত্ত মহাশয় বেশ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন-

প্রশ্ন : এই বাড়ির পুজোর বিশেষত্ব সম্পর্কে যদি কিছু বলেন -

উত্তর : বিশেষত্ব তো অবশ্যই আছে। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মজিলপুরের সমস্ত বাড়ির পুজোর নির্ঘণ্ট নির্ধারিত হত এই বাড়ির ঐতিহ্যবাহী সোনার ঘড়ির সময় অনুসারে। তাই বোধনের আগে সমস্ত বাড়ির প্রতিনিধিরা এসে সময় মিলিয়ে যেতেন।

প্রশ্ন : বাহ! আকর্ষণীয় একটা তথ্য জানলাম আপনার কাছে। ঘড়িটি কি এখনো আছে?

উত্তর : তা আছে বটে, তবে এই রীতি সময়ের সাথে সাথে শিথিল হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনাদের পুজোর রীতি-রেওয়াজ ঠিক কীরকম?

উত্তর : আগে পূজা মহালয়া থেকে শুরু হলেও বিগত পাঁচ বছর ধরে মায়ের বোধন হয় ষষ্ঠীতে। আমাদের বাড়ির পূজা গুপ্তপ্রেস মতে হয় এবং কায়স্থ বাড়ি হবার কারণে অন্ন ভোগের পরিবর্তে শুকনো ভোগ মা-কে নিবেদন করা হয়, আর রাত্রে থাকে শীতল ভোগ। আগে বলি হত, তবে তা এখন আর হয় না।

পঞ্জিকা অনুযায়ী, জন্মাষ্টমী বা তার পরের দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে পূজার আয়োজন শুরু হয়। বর্তমানে পশুপতি পোটো বংশানুক্রমিকভাবেই প্রতিমা নির্মাণ করেন। দেবী এখানে ডাকের সাজে সজ্জিতা এবং জরির শাড়ি ও গহনায় ভূষিতা হন। যদিও পূর্বে পারিবারিক পিতলের গহনায় দেবী অলংকৃত হতেন। মন্মথনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সর্বপ্রথম এই পূজার পৌরোহিত্য করেন এবং বর্তমানে তারই উত্তরসূরী পৌরোহিত্যের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তবে শুরুতেই যে বন্দুকের বিষয়টি জানানো হল তা এখনও প্রচলিত না হলেও সেই বন্দুক কিন্তু আজও বিরাজমান, তবে গোলা বন্দুকের পরিবর্তে টোটা বন্দুকটি এই বাড়ির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে ।

মাঝের বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের অন্তর্গত মিত্রপাড়ার অন্যতম একটি প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন পূজা হল মিত্র বাড়ির পূজা। জমিদার স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন মিত্রের হাত ধরে এই পূজার সূচনা এবং দীর্ঘ আনুমানিক ৩০০ বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে কালী পূজার সাথে সাথে এই জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গার আরাধনা চলে আসছে। রথের দিন শাল কাঠের কাঠামো পূজার মধ্য দিয়ে মূল পূজার শুভারম্ভ হয়। এনাদের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল, সম্পূর্ণ নতুন খড় দিয়েই কাঠামোতে বাঁধন সম্পন্ন হয়। দেবী এখানে সপরিবারে ডাকের সাজে সজ্জিতা হন এবং সোনা ও রুপার গহনায় অলংকৃত হন। মৃৎশিল্পী শম্ভু দাস মহাশয় বংশানুক্রমিকভাবে এই পরিবারের দেবীকে নির্মিত ও সজ্জিত করে চলেছেন।

পূর্বে নবরাত্রি ব্যাপী পূজা সম্পন্ন হলেও ইদানিং পঞ্চমীতে বোধনের মধ্য দিয়ে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। শুকনো ভোগ, লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় মাকে। বৈষ্ণব মতে এখানে দেবী পূজিতা হন এবং বিগত কিছু বছর ব্যাপী কালীপ্রসাদ সরখেল মহাশয় পৌরোহিত্যের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কুমারী পূজা। প্রতি বছর একজন বালিকাকে কুমারী হিসাবে পূজা করা হয়। বর্তমানে পূজার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিষ্ঠাভাবে পালন করে আসছেন কেদার মিত্র, কাশীনাথ মিত্র এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ।

সাক্ষাৎকার চলাকালীন এই বাড়ির কুলপুরোহিত কালীপ্রসাদ সরখেল মহাশয় এসে উপস্থিত হলে আমরা ওনার কাছ থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই-

Z & N প্রতিনিধি : এই বাড়িতে দেবী কোন মতে পূজিত হন?

উত্তর : এই বাড়িতে বলি সহ্য হয় না, তাই দেবীকে আমরা বৈষ্ণব মতেই পূজা করে থাকি। এমনকি কালীপুজো এখানে বৈষ্ণব মতেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : এই পূজার বিশেষ কোনো ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য কিছু জানা আছে?

উত্তর : একটা কথা না বললেই নয়, এই বাড়ির পুজো বন্ধ হয়েছে... তবে মা পুনরায় ফিরে এসেছেন। এই বাড়িতে ৩০০ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে কালীপুজোর মাধ্যমে শক্তি আরাধনা হয়ে আসছে এবং সারা বছর প্রতি অষ্টমী তিথিতে চণ্ডীপাঠ হয়ে থাকে। কাজেই মা-কে তো ফিরতে হতই। দেবী আরাধনা কিছুদিন বন্ধ হলেও, "মা পুনরায় গমনায়চঃ"।

পান্ডব বাড়ি

মজিলপুরের আরও একটি ঐতিহ্যবাহী পুজো হল পাণ্ডব বাড়ির পুজো। যে পুজোর সূচনাই হয়েছে জমিদার দত্ত পরিবারের সাথে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। প্রায় ২৭৫ বছরের পুরোনো এই পুজো শুরু করেন ভারত-খ্যাত দর্পনারায়ন ভট্টাচার্য। প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গে উঠে আসে ওনাদের পারিবারিক ইতিহাস এবং এই পূজা পত্তনের কথা। শান্তিরাম ভট্টাচার্য জানান– "তৎকালীন ভারত-খ্যাত তর্করত্ন দর্পনারায়ন ভট্টাচার্যকে স্থানীয় জমিদাররা যজমানের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমরা যজমানি করতে জন্মায়নি, আমরা অধ্যয়ন করতে জন্মেছি।"এ কথা শুনে জমিদার ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের দেওয়ানির অন্তর্গত বসতবাড়ি থেকে ভট্টাচার্য পরিবারকে উৎখাত করেন। নিজের আত্মগৌরব বজায় রাখতে দেওয়ানির বাইরে এক শ্মশানের কাছে জঙ্গল সাফ করে ও ভট্টাচার্য পরিবার বসবাস শুরু করে। এ ঘটনায় জমিদারের মুসাহেবরা চারিদিকে প্রচার করে যে, জমিদার ভট্টাচার্যদের বনবাস দিয়েছে। মহাভারতের পান্ডবদের বনবাসের সাথে তুলনা করে এই পরিবারের নাম হয় পাণ্ডব পরিবার। বর্তমানে এই সংলগ্ন অঞ্চলটি 'পান্ডব পাড়া' নামে পরিচিত। এতক্ষণ ধরে শান্তিলাল বাবুর কাছে পাণ্ডব বাড়ির ইতিহাস আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা জানতে চাইলাম এই বাড়ির পুজোর সূচনার কথা। শান্তিলাল বাবু জানান– "প্রথমত উৎখাত এবং দ্বিতীয়ত মুসাহেবদের রটনায় জেরবার হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ দুর্গাপূজার সূচনা করেন। এভাবেই কোথাও একটা আমাদের পারিবারিক গৌরব

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।"

এরপর থেকে সেই গৌরব অক্ষুন্ন রেখে আজও এই বাড়ির পুজো চলে আসছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর মত অনুযায়ী এই পুজো হয়ে থাকে। আগে মেষ এবং ছাগ বলি হতো কিন্তু বর্তমানে কুমড়ো এবং আখ বলি হয়। এই বাড়িতেও কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে, যা প্রাচীনকাল থেকে আজও অক্ষুন্ন। শান্তিলাল বাবুর কাছে এই বাড়ির পুজোর বিশেষ কোনো নিয়ম সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জানান—

"নবমীতে পাণ্ডব বাড়ি থেকে সমস্ত গ্রাম্য দেব-দেবীর মন্দিরে ডালা পাঠানো হয়। সবশেষে একটি কথা না বললেই নয়, যে দত্ত পরিবারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এই পূজার সূচনা হয়, পরবর্তীতে সেই দত্ত পরিবার ভেঙে যখন লাল দত্ত বাড়ির আলাদা দুর্গাপূজা শুরু হয়, তখন থেকে ভেট স্বরূপ কলাবউ স্নানের সকল সামগ্রী লাল দত্ত বাড়ি থেকেই আসে।"

পূজায় কর্মরত সমস্ত ব্যক্তিকে নতুন পোশাক দেওয়া হয় এই পরিবার থেকে। বর্তমানে দেবীর কৃপায় দু-পরিবারের সংঘর্ষ আজ অনেকটাই মলিন হয়েছে, সাথে এই দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিও ঘটেছে।

নীলমণি স্মৃতি বাড়ি

এবার এমন এক বাড়ির পুজোর কথা বলব, যা অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও সেই বাড়ির প্রতিটি ইটে কান পাতলে শোনা যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প। এমনকি শোনা যায় স্বয়ং নেতাজিও কখনো এই বাড়ির আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা বলছি 'নীলমণি স্মৃতি' বাড়ির চ্যাটার্জী পরিবারের পুজোর কথা। এই বাড়িতে মা ১৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন। এই পুজোর শুরুর দিনের কথা জানতে চাইলে শ্রী শান্তনু চ্যাটার্জী মহাশয়ের কাছে আমরা জানতে পারি—

"নীলমণি চ্যাটার্জী, দত্ত জমিদার বাড়ির নায়েক ছিলেন, তার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগেই এই পূজার সূত্রপাত হয়। আমরা চতুর্থ পুরুষ ধরে এই পুজোর ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছি।"

অন্যান্য বাড়ির মধ্যেই জন্মাষ্টমীর পরের দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে এই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়। মহালয়ার পরের দিন বোধনের মধ্য দিয়ে মাতৃ বন্দনার শুভ সূচনা হয়। টানা ১০ দিন ধরে চলে এই পুজো। অষ্টমী তিথিতে মাকে বিশেষ আমিষ ভোগ অর্পণ করা হয় এবং দুজন বালিকার কুমারী পূজার প্রচলনও আছে। পূর্ব সময়ে কাঙ্গালী ভোজনের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা আর নেই। শান্তনু চ্যাটার্জীকে পুজোর বলি সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জানান—

"বলি প্রথা আমাদের অপছন্দের। কিন্তু নবমীতে বাড়ির বড় কেউ একজন নিজের বুকে বেল কাঁটা ফুটিয়ে বুকের সেই রক্ত মায়ের পায়ে নিবেদন করেন।"

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে এই পুজো হয়ে থাকে, বর্তমানে শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী মহাশয় পৌরোহিত্যের ভূমিকা পালন করে আসছেন বিগত কিছু পুরুষ ধরে।

পূর্বে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মন্মথনাথ দাস এই পরিবারের মাতৃ মূর্তি নির্মাণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তার শিষ্য রবিদাস বিগত ১২-১৫ বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই বাড়ির আরও একটি বিশেষত্ব হল, এই বাড়িটি অনেকের কাছে 'শিল্পী বাড়ি' বলেও পরিচিত। শিল্প এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পকে সঙ্গে নিয়ে স্ব-গৌরবে মাতৃ বন্দনা করে আসছে 'নীলমণি স্মৃতি' বাড়ির চ্যাটার্জী পরিবার।

সরকার বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের উত্তর পাড়ার অন্তর্গত সরকার বাড়ির পুজো প্রায় ৩০০ থেকে ৩২০ বছর প্রাচীন। স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র সরকারের পূর্বপুরুষ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিকভাবেই এই পুজোর সূচনা করেন। প্রথম কিছু বছর খড়ের চালায় পুজো সম্পন্ন হলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে গোবিন্দ সরকার তার স্ত্রী রাইকিশোরী দেবীর স্মৃতিতে মন্দির ও ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন এবং সেখানেই পুজো স্থানান্তরিত হয়। রথের দিন সেগুন কাঠের কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে পূজার আয়োজন শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্ব পোটো এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ প্রদান করেন। মহালয়ার পর দ্বিতীয়াতে দালানের সন্নিকটে অবস্থিত বেল গাছে প্রথম বোধন হয় এবং এরপর মহাষষ্ঠীতে ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুজোর সূচনা হয়। এই পূজা 'প্রতিপদী কল্পারম্ভ' নামে পরিচিত। বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে এই সরকার বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। দেবী এখানে পারম্পরিকভাবে ডাকের সাজে ভূষিতা হন এবং অস্ত্র ও সাজ-সজ্জা থাকে রুপোর। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, অষ্টমীর দিন ৫/৬ জন বালিকা কুমারী বেশে পূজিতা হয় এবং তাদের পৃথক নামকরণও করা হয়। এরপর নবমীতে পঞ্চ-তরকারি, পায়েস ও পোলাও দিয়ে মায়ের মহাভোগ সম্পন্ন হয়। সারা পূজা ব্যাপী প্রত্যহ-ই চণ্ডীপাঠ হয়ে থাকে। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ সরখেলের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত অমল চক্রবর্তী মহাশয় পৌরোহিত্যের ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে সরকার পরিবারের শৈলেন সরকার মহাশয় এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি এই বাড়ির পুজো সম্পর্কে আমাদের তথ্য প্রদান করে সমৃদ্ধ করেছেন।

দাওয়ান বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের দাওয়ান বাড়ি প্রায় ২৪০ থেকে ২৫০ বছর ব্যাপী দুর্গাপূজার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। স্বর্গীয় চন্দ্রকেশর ভট্টাচার্য মহাশয় এই পূজার সূচনা করেন এবং সুদীর্ঘ সাত থেকে আট পুরুষ ধরে ওনার উত্তরসূরি মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়ে আছেন। রথের দিন কাঠামো পূজার মধ্য দিয়ে পূজার প্রস্তুতি শুরু হয় এবং ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হয়। পূর্বে, বেশ কিছু বছর ধরে বংশানুক্রমে মৃৎশিল্পীরা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করতেন। তবে বিগত কিছুকাল সেই ধারা ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে রবি দাস মহাশয় দেবীর মৃন্ময়ী রূপদান করছেন। এই বাড়িতে দেবী ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজে ভূষিতা হন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের সাথে কথোপকথন কালে আরও কিছু বিশেষত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এই বাড়িতে শাক্ত মতে পুরোনো সব আচার মেনে দেবী বন্দনা হয়। দুর্গাপুজোয় তিনটি বলি হয়— আখ, কুমড়ো এবং পাঁঠা। কথিত আছে, কোন একবার পাঁঠা বলি বন্ধ হলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে পাঁঠা নিজেই চলে আসে মন্দির দালানে। সকলের সেদিন মায়ের ইঙ্গিত বুঝতে আর কোনো বিলম্ব হয়নি।

মায়ের উদ্দেশ্যে দুই রকমের ভোগ রন্ধন করা হয়। প্রতিদিন সকালে হয় খিচুড়ি ভোগ এবং বেলার দিকে ধারাবাহিকভাবে দু-মন চালের সাদা ভোগ নিবেদন করা হয় দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে। প্রতিবছর মহাষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজা হয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণ পরিবার হওয়ার সুবাদে পরিবারের সদস্যরাই এই পূজায় পৌরহিত্যের দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

কান্ব্যায়ন বাড়ি

জয়নগর মজিলপুরের আরও একটি সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী পূজা হল কান্ব্যায়ন বাড়ির পূজা। সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পূজা ধারাবাহিকভাবেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সময়ের স্রোতে পূজার জাঁকজমক বা আড়ম্বরের শিথিলতা আসলেও পূজার রীতি-রেওয়াজ আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। মাননীয় আনন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রদান করে আমাদের সমৃদ্ধ করেন।

প্রাচীন জমিদার বাড়ি হওয়ার সুবাদে স্বভাবতই জমিদারির ঐতিহ্য বৃদ্ধি করার জন্যই এই পূজার সূচনা হয় এবং সূচনা করেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কান্ব্যায়ন মহাশয়। প্রতিবছর জন্মাষ্টমী তিথিতে কাঠামো পূজার মাধ্যমে পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী, আজও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতানুসারে এই বাড়িতে মাতৃ আরাধনা হয়ে চলেছে। দেবী এখানে শোলার সাজ এবং বেনারসীতে ভূষিতা হন এবং মায়ের মৃন্ময়ী রূপ চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূত হয়। এই বাড়িতে প্রাণী বলির পরিবর্তে আখ এবং কুমড়ো বলি বেশি প্রাধান্য পায়। মিষ্টান্ন, পঞ্চ-ব্যঞ্জন সহযোগে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে পাঁচু পোটোর পরিবার দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে আসছেন। তবে আনন্দলালবাবুর স্ত্রী জানান যে, এই ধারা মাঝে কিছু বছর ব্যাহত হয় এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করে আরো জানান যে এর ফলে প্রতিবারই মায়ের মুখের আদলের বদল ঘটেছে। তবে এই বছর ওনারা আশাবাদী যে আবারও শিবু পোটোর হাত ধরে মায়ের সেই পুরানো মুখের আদল ফিরে আসতে পারে।

মতিলাল বাড়ি

সমগ্র জয়নগর মজিলপুরের পুজোর ইতিহাস নিয়ে বলতে গেলে যে বাড়ির পুজো ছাড়া এই গল্প অসমাপ্ত, তা হল জয়নগরের সর্বপ্রাচীন মতিলাল বাড়ির দুর্গাপুজো। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল জয়নগরে এসে বসতি স্থাপন করেন। রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল আকবরের সময়কালে জলদর্শন নিয়ন্ত্রণের জন্য জয়নগর এলেও পরবর্তী সময়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে গেলে তিনি বাংলাদেশে পাড়ি দেন। এর প্রায় দেড়শ বছর পরে গুণানন্দ মতিলালের হাত ধরে জয়নগরে আবারও ফিরে আসে মতিলাল পরিবার। পরবর্তীকালে মতিলাল পরিবার শুরু করেন জয়নগরের সর্বপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পূজা, যা আজও প্রায় ৫৫০ বছরের বেশি সময় ধরে স্বমহিমায় চলে আসছে।

মহালয়ার প্রতিপদ থেকে ঘট পুজোর মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। বেদীতে দেবী মূর্তি স্থাপন করা হয় পঞ্চমী তিথিতে, কিন্তু পুজো শুরু হয় সপ্তমী তিথি থেকে। প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি এই বাড়িতে কুমারী পুজোর প্রচলন অক্ষুন্ন রয়েছে। এখানে মাকে দু'রকমের ভোগ নিবেদন করা হয়– বাল্য ভোগ এবং সাদা ভোগ। এছাড়াও মাছের একটি পদ নিবেদন করা হয় যা শিবের অনুচরদের জন্য উৎসর্গ করে মূল ভোগ থেকে সামান্য দূরে রাখা হয়। শিবের প্রসঙ্গ আসায় আমাদের প্রতিনিধি জানতে চাইলেন—

প্রশ্ন: শিবের অনুচরদের বিষয়টা একটু বিস্তারিত বলতে পারবেন?

উত্তর: এটি আসলে একটি মজার বিষয়। প্রথমত, এখানে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির থাকায় হর-পার্বতী একসাথে পূজিত হন এবং দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমরা জানি শিব পার্বতী কৈলাস থেকে মর্তে আসেন সেহেতু তাদের অনুচরদের কথা মাথায় রেখেই আমরা এই বিশেষ ভোগের আয়োজন করে থাকি।

প্রশ্ন: আপনাদের পুজোতে কি বলি প্রথার প্রচলন আছে?

উত্তর: হ্যাঁ। পূর্বে মোষ ও ছাগ বলি হলেও বর্তমানে তা আর নেই। কিন্তু এর পিছনে আছে এক বিরাট গল্প। ডক্টর বিমল কৃষ্ণ-এর বাবা ও কাকা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। যেহেতু বৈষ্ণব মতে দুর্গা আরাধনায় প্রাণ বলি নিষিদ্ধ, সেজন্য বলি প্রথা নিয়ে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং সম্পূর্ণভাবে দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। মাঝের ১০-১২ বছর দুর্গাপুজো বন্ধ থাকলেও ১৯৫৫ সাল থেকে পুনরায় শুরু হয় দুর্গাপুজো। তারপর থেকেই আমাদের পরিবারে আখ ও কুমড়ো বলি চলে আসছে।

এই পুজোর প্রতিটি অংশে রয়েছে প্রাচীন গৌরবমন্ডিত ইতিহাস। দীর্ঘ সময় ধরে এই পরিবার নিজ মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেই মাতৃ বন্দনা করে চলেছে। পরিশেষে যে কথা না বললে এই গল্প অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে তা হল– জয়নগরের মতিলাল পাড়ার ঐতিহ্যবাহী চন্ডীমন্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয় এই পরিবারের হাত ধরেই এবং এই মন্দির জয়নগর মজিলপুরের সর্বপ্রাচীন দুর্গাপূজার থেকেও অনেক বেশি প্রাচীন।

আমরা সময়কাল অনুযায়ী, জয়নগর মজিলপুরের ১২টি সর্বপ্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজোকে বাছাই করেছি। এছাড়াও জয়নগর মজিলপুরে আরও অসংখ্য বাড়ির পুজো বর্তমান। পরিশেষে বলা যায় যে আমাদের বনেদি বাড়ি পরিক্রমা এবং তথ্য সংগ্রহ করা কালীন কয়েকটি দুঃখজনক বিষয় উঠে এসেছে যা প্রতিটি বাড়িতেই লক্ষণীয়। বর্তমানে সর্বজনীন পুজোগুলোর ভীড়ে বাড়ির পুজোগুলোর জৌলুস অনেকটাই কমে এসেছে। তাছাড়া ব্যস্ত জীবনের চাপে পড়ে পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতি আরো একটি আক্ষেপের কারণ। বর্তমানে ব্যয়বহুলতার যুগে এসে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র পরিবারের সীমিত সদস্যের সহযোগিতায় পুজোগুলিকে গৌরবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পরিবারগুলির কাছে সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বশেষে, পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরোধ রইল যে পুজোর পাঁচটি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন আপনারা বাড়ির পুজোগুলোর সাথে কাটান। কথা দিচ্ছি নিরাশ হবেন না।

গাজনের ইতিবৃত্ত

ড. তরুণ কুমার দাস

গাজন উৎসব হল পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে পালিত একটি হিন্দু লোক উৎসব। হিন্দু ধর্মে পূজিত শিব, নীল, ধর্মঠাকুর ও নাগমাতা মনসা দেবীর পূজা হল এই উৎসবের কেন্দ্র-বিন্দু। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে বাবা শিবের ভক্তেরা অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা তাঁর আরাধনা করেন। চৈত্র মাসের অন্তিম দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার মাধ্যমে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়।

এবার আসা যাক, নামকরণে। কেউ বলেন, 'গর্জন' থেকে 'গাজন', আবার কেউ বলেন, 'গাঁয়ের জন'-এর উৎসব থেকে 'গাজন' শব্দটি এসেছে। উৎসবে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীদের উচ্চকণ্ঠ থেকে (গর্জন) গাজন শব্দ বা 'গাঁ' বা গ্রাম এবং 'জন' বা জনতা বা সাধারণ থেকে গাজন শব্দের সৃষ্টি। মূলত গ্রাম বাংলার গরীব, গুরবো, খেটে খাওয়া জনসাধারণের কাছে গাজন হল একরাশ আনন্দঘন উৎসবের মুহূর্ত। লোকমতে, গাজনের দিনে বাবা ভোলানাথের সাথে দেবী হরকালী (অন্য মতে দেবী পার্বতী)-এর বিবাহসম্পন্ন হয়। এই বিবাহ উৎসবে বরযাত্রী হিসেবে সন্ন্যাসীরা, নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব সবাই অংশগ্রহণ করে। তারা যেহেতু শিবের বরযাত্রী সুতরাং তারা সবাই বাবার গোত্রভুক্ত। এই কারণে গাজনের সময় সন্ন্যাসীদের বড়ই ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। কোথাও কোথাও বয়সে কনিষ্ঠ সন্ন্যাসীদেরকেও পায়ে হাত দিয়ে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা প্রণাম করে।

অন্য মতে, ধর্মঠাকুরের গাজন হল ধর্মঠাকুর ও দেবী কামিনী-কামাখ্যার (বাঁকুড়া জেলা) এবং দেবী মুক্তির বিবাহ উৎসব। মালদহে গাজনের নাম 'গম্ভীরা' এবং জলপাইগুড়িতে গাজনের নাম হল 'গমীরা'। চৈত্র মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়েও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজনকে বলা হয় 'হুজুগে গাজন'। নবদ্বীপে বুড়ো শিব, যোগনাথ, বানেশ্বর, দন্ডপানি, হংসবাহন, অলকনাথ, বালকনাথ, ভবতারন, পোলোশ্বর ইত্যাদি নামে শিব পূজিত হয় যা মূলত বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাবিত। এই শিব ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন নদীয়ায় গাজন উৎসব পালিত হয়। পূর্ব বর্ধমানের শ্রীখন্ডে ভূতনাথের গাজন বা দুগ্ধকুমার শিবের গাজন বিখ্যাত। প্রায় ১৫ দিন ধরে চলে এই গাজন উৎসব। বর্ধমানের মন্তেশ্বর গ্রামে শিবের পরিবর্তে মাতা কালীর আরাধনা করা হয়। এখানে পুরুষ মানুষ কালীর বেশে পূজা পায়।

হুগলি জেলার তারকেশ্বরে তারকনাথ শিবের নামে গাজন উৎসব পালিত হয়। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে ষাঁড়েশ্বর শিব, করুইয়ের বুড়োশিব, বাঁকুড়া জেলার ভক্তেশ্বর শিব, কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিব ও বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার বুনোঠাকুর শিবের গাজন বিখ্যাত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্ব বর্ধমানের কুড়মুনের গাজনে সন্ন্যাসীরা সারা মুখে রং মেখে, সং সেজে শ্মশানে নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করে। করুইয়ে নীল পুজোর দিন বুড়ো শিবকে সারা বছর পর শিবপুকুর থেকে তুলে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করা হয়।

আচার – কর্মাদি:

"পদ্মের ফুলে তুষ্ট আমার অমিয় সাগর।
ধুতরার ফুলে তুষ্ট আমার সন্ন্যাসী নাগর!
কালীদেহে তুললাম ফুল জাহ্নবীতে ধুলাম,
গঙ্গাজলে শুদ্ধ ফুল গাজনে আনিলাম।"

চৈত্র মাসে গাজন উৎসবের আগের রাতে শিবের সিংহাসন জাগরিত করতে নদীয়া-যশোরে এই ফুল শুদ্ধি ছড়ার প্রচলন। তারপর শুরু হয় 'খাটনি' বা 'ধূপচি' নৃত্য। দ্বিপ্রহর রাতে শ্মশানে হাজরা ঠাকুরের ভোগ প্রেরিত হওয়ার পর শিব পুজোর সূচনা। খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সময় গ্রামবাংলায় কৃষক, কারিগর, জেলে, মালো, হাঁড়ি, মুচি, বাউরি, বাগদি-কৌম ও সমাজের মানুষেরা শিব গোত্রের অধিকারী হন। সমাজে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথাকথিত নীচু জাতের মানুষগুলো অনভিপ্রেত সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে। উনিশ শতকে এই গাজন উৎসবকে 'ইতর জনের উৎসব' বলে চিহ্নিত করা হত।

গাজন উৎসবের পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথম দিন শিব ভক্তেরা গ্রামের মধ্যে থাকা বা নিকটবর্তী অন্য গ্রামের শিব মন্দিরে পুন্যস্নান করে নতুন পোশাক পরিহিত হয়ে বাবার উত্তরীয় ধারণ করে। গ্রামীণ ভাষায় একে 'উত্তুরী' ধরা বলা হয়। এই আচারের মাধ্যমে সন্ন্যাসী হিসেবে তারা শিব গোত্রে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী দিনগুলিতে সন্ন্যাসীরা পালন করে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন। এই সময় ফল-মূল, ছোলা, বাতাসা ইত্যাদি খাবার সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করে। দ্বিপ্রহরে তারা এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাত-ভোগ রন্ধন করে। মাটির মালসায় আতপচাল, আলু, মুগডাল ইত্যাদি একসঙ্গে রেখে খড়ের আগুনে রন্ধনকার্য সম্পন্ন হয়। হাতা হিসাবে ব্যবহার করা হয় কলাপাতার ডাঁটি। পরিষ্কার কলা পাতায় ঘি সহযোগে এই মালসাভোগ ভক্ষণ করেন ও সন্ন্যাসীরা খড়ের আঁটির আসনে বসেন। রাতে বিশ্রাম

নেবার জন্য সন্ন্যাসীরা মেঝেতে খড়ের বিছানা করেন। এই কৃচ্ছসাধনের একটাই মূল উদ্দেশ্য হল ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করা, যেন তিনি তার করুণা ধারায় সবাইকে সিক্ত করেন।

গাজন উৎসবে সন্ন্যাসীরা বাবা ভোলানাথ-এর উদ্দেশ্যে নানা রকম ছড়া ব্যবহার করেন আরাধনা হেতু।

"ওই যায়রে ওই যায়

আমার ঠাকুর ওই যায়

ফুল ফুটেছে রাঙা পায়

সেই ফুল তুলব, শিব পূজা করবো

হর হর বিশ্বেশ্বর, ব্যোম,ব্যোম, ব্যোম।"

এই গাজন উৎসবের দিনগুলোতে বাংলার গ্রামের মানুষেরা সবাই মেতে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। হর-পার্বতী, ভূত-প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী এইসব সং সেজে মানুষেরা পাড়ায় পাড়ায় গান-বাজনা করে বেড়ায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রান্তিক গ্রামগুলিতে যেমন- কাকদ্বীপ, নামখানা, মৈপীঠ, কৈখালী, পাথরপ্রতিমা, সন্দেশকালী, ক্যানিং, নিমপীঠ, সাহাজাদাপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, বিষ্ণুপুর-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই গাজন উৎসবের দিনগুলিতে মানুষের বিনোদনের জন্য গাজনের আসর পাতা হয়। একে 'গাজন তলা' বলে। নারকেল পাতা, বাঁশ, খড় সহযোগে বাবা শিবের ঘর বাঁধা হয় যেখানে একজন মূল সন্ন্যাসী ও অন্য সন্ন্যাসীরা ভোলানাথের পূজা-অর্চনা করেন। এই শিব ঘরের সম্মুখে এই গাজন তলার আসর বসে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে সাজিয়ে ছোট ছোট নাটিকা প্রস্তুত করা হয়। হাস্যকৌতুক বা রম্য নাটিকাকে 'কমিক' বলা হয়। অশ্রুসজল সামাজিক নাটিকাকে 'প্যাথোস' বলা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সেই নাটিকাগুলির মহিলা চরিত্রগুলি অভিনয় করেন মূলত পুরুষেরা। এই নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় গাজন ছাড়াও মনসা গান ও শীতলা গানেও দেখা যায়। এক-একটি গাজন দল সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা তাদের গাজন গান পরিবেশন করেন। এই পাড়ার দল ওই পাড়ায় গাজন গান গাইবে এবং ওই পাড়ার দল এই পাড়ায় গাজন গান গাইবে— এইভাবে এক-একটি গাজন দল প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি আসরে গান গায়। একে বলে 'আসর ভাঁটা'। কিছু কিছু গাজন তলায় সেখানকার সংগঠকদের উদ্যোগে প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। পৌরাণিক কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে রচনা করা হয় আসর বন্দনা। তারপর রাধা কৃষ্ণের অমর প্রেম কাহিনীর উপর রচনা করা হয় রাধা-কৃষ্ণের গান। তারপর নারী পুরুষের প্রেমের সম্পর্কের ওপর রচনা করা হয় 'লাভ ডুয়েট'। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানগুলিতে যে গান গাওয়া হয়— তা কিন্তু হিন্দি এবং বাংলা সিনেমার বা আধুনিক ঘরানার গানগুলির প্যারোডি। গল্পের সঙ্গে সমতা রেখে রচনা করা হয় এই গানগুলিকে। উদাহরণস্বরূপ আসর বন্দনার ভাষা এইরূপ —

"সত্যম তুমি প্রভু

শিবম তুমি প্রভু

এত ডাকি তোমারে

কেন পায়না দেখা কভু

সুন্দরম, বাবা তুমি হে

এসো হে, এই আসরে।"

এই গাজন গানের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার মানুষদের প্রতিভা ও তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গাজন যে শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে এই গাজন শব্দের। যেমন এক প্রচলিত ছড়া গানেও আছে—

"আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই।

ঠাকুমা গেছে গয়া-কাশী, ডুগডুগি বাজাই।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে গ্রাম বাংলার গাজন উৎসবের সজীব উপস্থিতি আছে। সাহিত্যিক লিখেছেন, "চড়কের আর বেশি দেরী নাই। বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল।"

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "গাজনের বাজনা বাজা /কে মালিক, কে সে রাজা?/ কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?"

এই সীমিত পরিসরে গাজন সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা ও সেই সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর নয়। আসলে গাজন হল গ্রাম বাংলার প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে একটা আবেগ, একটা ভালো লাগার মাধ্যম। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিনোদনের হরেক মাধ্যমের ভিড়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে এই দেশজ সংস্কৃতি। বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে সেই গাজন উৎসব আজও হয়ে আছে 'ইতর জনের উৎসব'। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনই বাঁচিয়ে রাখবে গাজন ও চড়ক পূজার মতো এই ধর্মীয় লোক-সংস্কৃতি গুলিকে।

তথ্যসূত্র

1. https://bn.Wikipedia.Org
2. https://eaibanglai.com
3. WWW.anandabazar.com
4. https://bangla.aajtak.in
5. https://ekhonkhobor.com

দেশ-বিদেশে সংস্কৃত চর্চা

পিঙ্কি চক্রবর্তী

সংস্কৃত ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা। যে কারণে এই সংস্কৃত ভাষাকে অনেক ভাষার 'জননী' বলা হয়ে থাকে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই ভাষাচর্চার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'আধুনিকতা' কথাটি অনেকের কাছেই শোনায় 'সোনার পাথর বাটি'র মতো অর্থাৎ অস্তিত্বহীন অসম্ভব কোন বিষয়। এর কারণ কী জানেন? এর কারণ হল, অনেকের ধারণা সংস্কৃত মানে কেবলমাত্র মন্ত্র, বেদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি। আর এই সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিকরা হলেন অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভর্তৃহরি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখেরা। এই যুগে সংস্কৃত ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রচনা নেই। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সংস্কৃতপ্রেমী সাহিত্যিক কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাদের রচনা বিষয়বস্তু প্রভৃতির বিচারে নিতান্ত প্রচলিত। কিন্তু এই সত্য আজ পরীক্ষিত। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমানে আজ পর্যন্ত ভারতের সর্বদিকে সংস্কৃত চর্চা পূর্বের মতোই প্রবাহমান ধারায় বয়ে চলেছে।

গোটা ভারতে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম এমন কি বিদেশেও যে এই ভাষার প্রভাব কতটা বাস্তবিক, এই প্রসঙ্গে আপনাদের অবগত করব।

প্রথমেই বলি, উত্তর ভারতের কাশ্মীর, জম্মু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এসব স্থানে সংস্কৃত চর্চা যে অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল তা অলংকার শাস্ত্রে ইতিহাস থেকেই জানা যায়।

কাশ্মীরের বিশ্বনাথ রেওপাদ ও বদরীনাথ কাল্লা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিশ্বনাথ রেওপাদ 'শ্রদ্ধানন্দ চরিত' নামে একটি চরিতকাব্য রচনা করেন যাতে ৪৫৯টি শ্লোক আছে অন্যদিকে বদরীনাথ কাল্লা 'কাশ্মীর ক্রন্দনম্' নামে একটি খন্ড কাব্য রচনা করেন। তার রচিত আরেকটি কাব্যের নাম 'কাশ্মীর সৌরভম্'। জম্মুতেও বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সংস্কৃত কবি ও পন্ডিতের নাম পাওয়া যায়। যেমন- শ্রী রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সুখদেব শাস্ত্রী প্রমুখ। পাঞ্জাবের সংস্কৃত চর্চার ধ্বজাধারী অমির চন্দ্র শাস্ত্রী 'গীতিকাদম্বরী' নামে গীত সংকলন তাঁর প্রথম রচনা। হরিয়ানা হল একটি নবগঠিত রাজ্য এখানে সংস্কৃত চর্চা বহু প্রাচীনকাল থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে। ছজ্জুরাম বিদ্যাসাগর, হাজারিলাল শর্মা এখানকার বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত ব্যক্তি। ছজ্জুরাম বিদ্যাসাগর 'শিবকথামৃতম্' নামে ৯৮১টি শ্লোক বিশিষ্ট একটি কাব্য রচনা করেন। ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়ার সুবাদে দিল্লিতে বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা আছে। শুধুমাত্র যে দিল্লি-বাসী এমনটা নয়, দিল্লি-প্রবাসী বহু সংস্কৃত পন্ডিতের রচনায় দিল্লির সংস্কৃত চর্চার সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন প্রভুদত্ত শাস্ত্রী, শংকরদেব অবতারে, রামকরণ শর্মা, সত্যব্রত শাস্ত্রী, পরমানন্দ পান্ডেয় শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। এই পন্ডিতেরা বিভিন্ন মহাকাব্য, নাটক, রূপককাব্য, খন্ডকাব্য রচনা করে প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ এই দুটি জায়গাও সংস্কৃত চর্চায় কোন অংশে পিছিয়ে নেই। এখানকার প্রতিভাবান কবিদের নাম ও তাঁদের রচনাগুলি হল জ্বলন্ত নিদর্শন। হিমাচল প্রদেশের দিবাকর দত্তশর্মা প্রধানত জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত আসি পূর্ব ভারতের কথা। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খন্ড—এই সব স্থানে সংস্কৃত চর্চার যথেষ্ট প্রসার দেখা যায়। বিহারে বহু প্রথিতযশা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির অবদানে এই অঞ্চলের সংস্কৃত চর্চার ঐতিহ্য সমানভাবে বয়ে চলেছে। জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর 'কাকলী' নামক সংস্কৃত কাব্য সংকলন-এর অভিনবত্ব, রচনাশৈলীর মাধুর্য, গীতিধর্মিতা দেখে সহজেই তা বোঝা যায়। অন্য আরেক ব্যক্তিত্ব জগন্নাথ পাঠকের লেখা বিখ্যাত মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' ১৮টি সর্গে সম্পূর্ণ অসাধারণ রচনাশৈলী পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যার নারায়ণ রথ, নারায়ন দাশ এঁনাদের কৃতিত্ব দেখা যায় তাঁদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, নাটক প্রভৃতিতে। আসামের বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী, ত্রিপুরার পন্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ঝাড়খণ্ডের দীনেশ প্রসাদ পান্ডেয় ও বিনেশ্বর পাঠকের মতো পন্ডিতের বিভিন্ন রচনাশৈলী এই সব স্থানের সংস্কৃত চর্চার ঐতিহ্য চিরাচরিতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

তৃতীয়তঃ এবার দক্ষিণ ভারতের পালা। প্রথমে যেটা না বললেই নয়, তামিলনাড়ুর মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর কথা। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার 'ভাসের নাটকগুচ্ছ' প্রকাশ করে ইতিহাসে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, ইনি একজন সু-কবিও ছিলেন। আরেক ব্যক্তিত্ব ভি. রাঘবন্ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'উদাত্তরাঘবম্' নাটক, অনেক রূপক কাব্যগুলিতে তাঁদের প্রতিভা

ও সংস্কৃত চর্চার গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কেরালার পি.কে. নারায়ন পিল্লাই, অন্ধপ্রদেশের শ্রীভষ্যং বিজয়সারথি, কর্নাটকের জগণ্ড বকুল ভূষণ প্রমূখদের রচনাশৈলী দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃত চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় করে রেখেছেন।

সবশেষে পশ্চিম ভারত। এখানকার সংস্কৃত চর্চা কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। পশ্চিম ভারতে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এতদ্ অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চার প্রসার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এখানকার মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, রূপক, কথাকাব্য সবকিছুতেই কবিদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্থানের ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রীর সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্রজভাষায় সমান দক্ষতা ছিল। ইনি আবার বহু গীতও রচনা করেছেন। ব্রজভাষার কোমলতা তিনি সংস্কৃতে রূপদান করেছিলেন। যেমন- সাহিত্যবৈভবম্, জয়পুরবৈভবম্ ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রের শ্রীরামবেলংকর, গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের রচিত বহু মহাকাব্য, চরিতকাব্য, নাটক, রূপককাব্য রচনা এখানকার সংস্কৃত চর্চার নিপুনতা বহন করে। আবার গুজরাটের দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা আমরা অনেকেই জানি। তিনি নিজে বেদ ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সর্বত্র সংস্কৃত চর্চার কথা তো আমরা জানলাম, কেবল নিজেদের দেশে নয়, বিদেশেও এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নসহকারে পঠন-পাঠন ও গবেষণা হয়ে থাকে।

USA-তে প্রায় ২৬টি University-তে এই সংস্কৃত বিষয়ে চর্চা হয়। তার মধ্যে Brown University, সেখানকার Classics Department-এ বিষয়টি পড়ানো হয়। California Institute of Integral Studies, সেখানে Asian and Comparative Studies বিভাগে সংস্কৃত পড়ানো হয়। John Hopkins University, Harvard University, Emory University, University of Florida প্রভৃতি আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চা করা হয়।

Canada -এর Mc Gill University, Concordia University, University of British Columbia এরকম বেশ কিছু University-তে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

Asia Japan-এ Kyoto University, Russia-তে Moscow State University প্রভৃতি। এছাড়া Australia, Great Britain, Italy, Norway, Sweden, Switzerland, Europe Germany এরকম বিভিন্ন দেশের প্রচুর University-তে সংস্কৃত বিষয়ে বহু যত্ন সহকারে পঠন-পাঠন হয়ে থাকে।

এখানে ভারতের বাইরে সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিষয়ে পাঠ্যক্রমের দেখা মেলে।

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান মূলত শিক্ষাপ্রসারের জন্য কাজ করে থাকে এবং গবেষণা বিষয়ে এর প্রভাব অপরিসীম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও এই সংস্কৃত ভাষার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব যে কতটা গভীর, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আজকের শিশুরা কি যান্ত্রিক?

শম্পা সিনহা

আজকাল বেশিরভাগ মানুষের মুঠোর মধ্যেই সারা দুনিয়াটাই চলে এসেছে। দেখা যায় আট থেকে আশি, আরে একটু দাঁড়িয়ে যান! শুধুমাত্র আট কেন! আটের কম বয়সীরাও মুঠোফোনের মোহতে মত্ত হয়ে পড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় ২৩.৮০ শতাংশ শিশু ঘুমনোর আগে বা ঘুমতে যাওয়ার সময় স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারও বাড়ে। এতে শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অনুপযুক্ত সময়ে স্মার্টফোনের ব্যবহার শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে শিশুদের মধ্যে মনসংযোগের মাত্রা হ্রাস পায়। দেখা গেছে, প্রায় ৩৭.১৫ শতাংশ শিশুদের ঘন ঘন স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে মনসংযোগের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার কথায় আসি। আমি একান্নবর্তী পরিবারেই বড়ো হয়েছি। আমাদের ছিল দাদু, ঠাকুমার মতো দুজন সঙ্গী। যাদের কাছে ছিল একটা আস্ত গল্পের ঝুলি। শুধু গল্প নয়, তার সাথে চলতো খেলা, হাসি, মজা আরও কত কি! কিন্তু এখন সেসব হারিয়ে গেছে। আজকাল পরিবারটা টুকরো টুকরো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাবা-মা নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। একজন শিশুকে সময় দিতে পারছে না তারা। তাদের বাড়ির সাহায্যকারীর কাছে সঁপে দিচ্ছে তাকে। যার ফলে তারা হয়ে পড়ছে সঙ্গীহীন। তাই তাদের একাকিত্ব কাটানোর জন্য শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল।

এবার আসি, গল্প বলার কথায়। সেই রাজকুমার, রাজকুমারী, সুয়োরানী, দুয়োরানী, তেপান্তরের মাঠ, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, সাত-সমুদ্র–তেরো-নদীর পারের কথা কোথায় যেন হঠাৎ উবে গেল। রূপকথার দেশের দরজাটা প্রায় যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিশুরা জানে না বুদ্ধু-ভুতুম-এর গল্প, যেখানে একটি বানর আর একটি পেঁচাও একই মায়ের সন্তান হতে পারে। আজকের বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করুন তো, কজন জানে এই গল্পগুলো? ঠাকুরমার ঝুলির বিভিন্ন চরিত্ররা তাদের দুঃখ-কষ্টগুলোকে জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। রাজা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে কিংবা সুয়োরানীর কুমন্ত্রনায় রাজা কীভাবে পুতুল হয়ে যায়, কীভাবে দুয়োরানী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনের কুটিরে বসবাস করে এসব তাদের কাছে অজানা। তারা মোবাইলের কয়েকটি খেলা, বর্তমানে রীলস আর বেশিরভাগ বিদেশী কার্টুনের মধ্যেই ডুবে থাকে। এর ফলে, রাজা কিংবা সুয়োরানীর প্রতি তাদের কোনো ক্ষোভ নেই বা দুয়োরানীর দুঃখে তারা কাতরও হয়না। এর ফলে কোনো অনুভূতি, কল্পনাশক্তি, চিন্তাভাবনা, ভালো-মন্দ কোনোকিছুই তাদের মনে দাগ কাটে না।

আমাদের রোজনামচায় কিছু ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে পড়ে। ট্রেনে যাতায়াতের সময় জানলার ধারগুলি ফাঁকাই থাকে আজকাল। কেননা, বাচ্চাদের মধ্যে ভীড় ঠেলে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখা ও ট্রেনের সাথে সাথেই গাছপালা, ঘরবাড়ি অবিরত ছুটে চলতে দেখার যে মজা ও কৌতূহল তা আর নেই বললেই চলে। ধরুন, আমাদের বেলায় যদি একটা জানলার ধারের সিট কোনোক্রমে জুটত, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু এখন দেখি, বাচ্চাদের হাতেই মায়েরা মোবাইল দিয়ে বসিয়ে রাখছে কিছুটা সময় ভুলিয়ে রাখার জন্য। আরও কিছু জিনিস থেকে আজকাল চোখ এড়িয়ে যায়না। দশ-বারো বছর আগেও পর্যন্ত মায়েরা ভাত মাখিয়ে নানা রকম গল্প বলতো, খেলার ছলে নানা পাখি, ফুল দেখিয়ে তাদেরকে খাওয়াতো। তাছাড়া নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত মায়েদের। শিশুদের মুখে একটাই প্রশ্ন থেকে যেত, "তারপর কী হল?" কিন্তু সেই প্রশ্নটাই হারিয়ে গেছে। এখনকার মায়েরা মোবাইল চালিয়ে দিয়ে অনায়াসে দশ মিনিটের মধ্যে সেই খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। সেই শিশুটি জানেই না যে, সে কী খাচ্ছে আর তার স্বাদই বা কেমন! প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত খাওয়ালেও সে খেয়ে নিচ্ছে, আবার কম খাওয়ালেও সে কিছুই বলে না তার পেটটা ভরলো কিনা! কারণ সে তার হাতের ঐ মোবাইলটাকেই গোগ্রাসে গিলছে। এর ফলে বাচ্চাদের হজম শক্তি ও চর্বনক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

এইসমস্ত ঘটনার দায়ভার কিন্তু মা কিংবা বাবাদের ওপরেই বর্তায়। একটি শিশু জন্মানোর পর তাদের দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন থাকে একধরণের কাদার তালের মতো। তাকে যেভাবে তৈরি করা হয়, সেই ভাবেই তৈরী হয়। মায়েরা যদি তাদের হাতে মোবাইল ফোন না তুলে দিয়ে তাদেরকে সঙ্গ দেয়, তাহলে তাদের ভীতটা মজবুত হয় গোড়া থেকেই। তাদেরকে গল্প শোনানো, তাদের সাথে

খেলা করা, গান করানো ও শোনানোর অভ্যাসের মধ্যে নিয়মিত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আজকের দিনে। বিকেলে খেলার মাঠ, পার্ক, বন্ধুদের সাথে ছোটাছুটি করে খেলাধুলার অভ্যাসগুলো তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। আসলে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশেষত যেসব মায়েরা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্তও নয়, তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য মোবাইল ফোনটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি, তার ছোট্ট শিশুটিকে সঙ্গ না দিয়ে। আবার কিছু কিছু মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে রীলস-ভিডিওর মাধ্যমে হাসির খোরাক তো করছেই এমনকি উপার্জনের পথ হিসাবে ছোট্ট শিশুটিকে বেছে নিচ্ছে। এটি সাময়িক এন্টারটেইনের পথ হলেও সেসব মায়েরা জানে না যে তারা কতটা শিশুর ক্ষতি করছে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা এখন মোবাইলের দাস হয়ে গেছি। ছোটরাও ব্যতিক্রম নয়। এর ফলে এই আসক্তি স্লো-পয়জনিং-এর মতো কাজ করছে শিশুদের ক্ষেত্রে। আমরা জানি, মোবাইল ফোন থেকে নির্গত হয় একধরণের রেডিয়েশন। এই রেডিয়েশন কিন্তু বড়দের তুলনায় শিশুদের বেশি ক্ষতি করে। তাদের নার্ভাস সিস্টেম ও ব্রেন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফলত, ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাছাড়াও স্ক্রিন টাইম বাড়লে চোখের উপরও চাপ পড়ে। দিনদিন চোখে মাইনাস পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা অমনোযোগী তো হয়ই, তার চেয়ে বড়ো কথা, বহুক্ষণ মোবাইল দেখে চুপ করে থাকার ফলে তাদের জিভের জড়তা কাটে না। তাই তাদের কথা ও উচ্চারণ স্পষ্ট হয়না। তার কথা অনেক দেরিতে শেখে। সারাদিন মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে তারা কোনো ডিসিপ্লিন শেখে না। বাবা, মা, ভাই, বোনের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয় না। তাই এখনও সময় আছে, যদি এটাকে নিয়ে না ভাবে আজকের মা কিংবা বাবারা, তাহলে আসন্ন দিনগুলো খুবই সংকটজনক হয়ে উঠবে। তাই, আসুন আমাদের আগামী ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তুলে দি সুন্দর পৃথিবীর দায়িত্ব। যারা এই পৃথিবীটাকে যান্ত্রিক করার পরিবর্তে আরও জীবন্ত করে তুলতে পারে ও একজন সত্যিকারের মেরুদণ্ডী, সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

গৌরী এলো

পূর্বা সরকার

বর্ষার উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করতে চলে আসে শরৎ। আকাশে ঘন কালো মেঘের বিদায় ঘন্টা বেজে ওঠে, তারপর পেঁজা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে চলে আসে শরৎকাল। সমগ্র প্রকৃতি সেজে ওঠে এক নতুন সাজে। পথের দুধারে কাশফুলের আসর বসে, আর শরতের শিশির মাখা শিউলি ফুল মায়ের আগমনের দিন গোনে। চলে আসে মহালয়া, আশ্বিনে শারদ প্রাতে বেজে ওঠে মায়ের আগমনীর সুর। এই দিনই হয় মায়ের চক্ষুদান। আর বাঙালির মনে প্রাণে বেজে ওঠে ঢাকের আওয়াজ। প্রথমা, দ্বিতীয়া.....করে দিন গোনার শুরু।

গ্রামের নাম শিবপুর। একটি ছোট গ্রাম, গ্রামটি ছোট হতে পারে তবে এই গ্রামের মানুষগুলো একে অপরের সাথে এক বিশাল মেলবন্ধনে আবদ্ধ। এই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের ছেলে হলেন রামতনু দত্ত, তার স্ত্রী সুপ্রভা। রামতনুবাবু ছয় মাস হল একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছেন। সমগ্র গ্রামের মানুষের পাঁচটা দিন মায়ের সাথে কাটে তারই দালানে। পুজোর সব কাজই বাড়ির মানুষদের সঙ্গে গ্রামের মানুষেরা সকলেই ভাগ করে নেয়। কারণ, তারা জানে 'মা' তো সবার।

মহালয়া থেকে দিন গুনতে গুনতে অবশেষে ষষ্ঠী তিথিতে মায়ের বোধনের সময় এসে গেল। পুরোহিত মশাই যথারীতি বেলতলাতে ঘট পেতে মায়ের বোধনের আয়োজন করছেন। ঠিক তার পাশেই দালানে আছেন দেবী প্রতিমা, চালচিত্র দিয়ে সুসজ্জিত মহামায়া, দশপ্রহর রণধারিনী। পুরোহিত মশাই পুজোর আয়োজন করতে করতে হঠাৎ আচমকা দেখলেন তার পিছন থেকে কেউ একজন ছুটে দালানে উঠে গেল। তিনি পিছন ফিরলেন কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। ভাবলেন হয়তো তার মনের ভুল। তিনি মায়ের বোধন শুরু করলেন। সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল তার নাম বৃষ্টি। সে পুজো দেখছিল কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিল না, তার প্রশ্ন "বোধন মানে কী?" পুরোহিত মশাই সেই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি বললেন, "সীতা উদ্ধার ও রাবণ বধের পূর্বে অকালে বা অসময়ে দেবী মহামায়াকে জাগ্রত করেছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র।" সেই সময়পর্ব থেকে এই 'অকালবোধনের' সূচনা। এই বোধনের মাধ্যমে শিবপত্নী আদ্যা শক্তি মহামায়াকে মর্তে আহ্বান জানানো হয় দুষ্ট ও অশুভ শক্তির বিনাশ করে বিশ্ব সংসারকে রক্ষা করার জন্য। ষষ্ঠীর নিশি এইভাবেই সমাপ্ত হল।

সপ্তমীর সকাল শুরু হল নবপত্রিকা স্নানের মধ্য দিয়ে। নবপত্রিকা বা কলাবউ সপ্তমী থেকে চার দিন গণেশের পাশে থাকে। এই দিনই দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রত্যেকের সামনে ঘট স্থাপন করা হয়। তারপরে শুরু হয় মহাসপ্তমীর পূজা। ভক্তরা একে একে এসে উপস্থিত হন মায়ের সামনে, পুরোহিত মশাই মাইকে মন্ত্র উচ্চারণ করে সমগ্র প্রকৃতিকে এক রোমাঞ্চকর সুরে আন্দোলিত করেন। মায়ের পুজোর সময় সমাপ্ত হলো। প্রসাদ বিতরণ হবে, ওমা একি! নৈবেদ্যর ডালা থেকে ফল সন্দেশ কম লাগছে? সুপ্রভাত ডালা ভাঙতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। এখানে এসে কারোর পক্ষে ডালা থেকে প্রসাদ খাওয়া সম্ভব না। তাহলে কী হতে পারে? এমন অসম্ভব ঘটনা সে তো আগে কখনো দেখেনি। সুপ্রভা কাউকে কিছু না বলে প্রসাদ বিতরণ করে দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করতে চলে গেল। কিন্তু সারাদিন এ প্রশ্ন যে তার পিছু ছাড়লো না। সপ্তমী নিশি সমাপ্ত।

মহাষ্টমীর সকাল। এই সকালের অনুভূতি অসাধারণ যা কিনা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। শাস্ত্র মতে, এই দিনই দেবী দুর্গা অসুর বধ করে সমগ্র বিশ্ব সংসারকে রক্ষা করেছিলেন। আবার এই দিনেই রামচন্দ্র একশো আটটি পদ্ম দিয়ে মায়ের আরাধনা করেছিলেন। তাই এই দিনের মাহাত্ম্য অনেকখানি। গ্রামের সকল মানুষ প্রায় মহাষ্টমীর অঞ্জলীর জন্য প্রস্তুত হয়ে রামতনুবাবুর বাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ মায়ের নৈবেদ্যতে সুপ্রভার হাতে বানানো অনেক রকম ভোগ যুক্ত হয়েছে, মহাষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হয়েছে। সবাই ভক্তি ভরে অঞ্জলি দিচ্ছে। পুরোহিত মশাই ভক্তদের দিকে ফিরে মাইকে একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন, এইভাবেই মায়ের অঞ্জলি সমাপ্ত হল। সুপ্রভা আগের দিনের মতো আজও সেই একই জিনিস লক্ষ্য করল, তবে আজকে ফল সন্দেশের ডালাটা ভরাই আছে। পরমান্ন আর খিচুড়ি ভোগের ডালা থেকে কিছুটা ভোগ নেই। সুপ্রভা আবারও কাউকে কিছু বলল না। ভোগ বিতরণ করে সন্ধিপূজার আয়োজনে প্রদীপ সাজানোতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

দেবী চণ্ডীর আরাধনা করে নবমী তিথির সূচনা হয়ে থাকে। এইদিন হোম-যজ্ঞ করে একশো আটটি প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের আরাধনা করা হয়। আগের দিনের মতো আজও সুপ্রভা নিজের হাতে ভোগ রান্না করেন, নৈবেদ্য সাজিয়ে সামনে রেখেছেন। আজ সে এই রহস্যকে অনুসন্ধান করে তবেই ছাড়বে। সে একভাবে পুজো দালানে বসে থাকল। একভাবে তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করল মায়ের নৈবেদ্যর উপর। হঠাৎ কেউ একজন ডেকে উঠল, 'মা', 'ও মা','মা'! সুপ্রভা অবাক হয়ে উঠে গেল 'মা' বলে কে ডাকল তা দেখার জন্য। সে কাউকেই দেখতে পেল না, হতাশ হল,

আবার পুজো দালানে ফিরে এলো। ওমা একি! আবারও নৈবেদ্যর ডালা কিছুটা খালি এইবারেও সে রহস্য ভেদে অসফল। সে আজও কাউকে কিছু না বলে চুপ হয়ে থাকল। এইভাবে নবমী নিশির অবসান হল।

সারা বছরের সবচেয়ে বিষাদের দিন এসে উপস্থিত। নবমীর রাতের অন্ধকারের শেষে যে ভোরের আলো শিশির ভেজা ঘাসের উপর পড়ে তা বোধহয় বাঙালির জীবনের সবচেয়ে কঠিন সকাল। কিন্তু একটা বছর পরের মহালয়ার দিন গোনা সেই দিন থেকেই শুরু হয়ে যায়, যা আবার নতুন ভোরের আলো নিয়ে আসে। যাই হোক, চলমান সময়কে তো মানতেই হবে। দশমীর সকালে মন-মরা অবস্থায় পুজোর আয়োজন করছে সবাই। মায়ের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে যে এইবার মাকে বরণ করা হবে, ও গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হবে। বরণ সমাপ্ত। মাকে সবাই দালান থেকে নীচে নামাবে। হঠাৎ সবাই অবাক, একি? রামতনুবাবু ও সুপ্রভা ছুটে এসে দেখে মাতৃ প্রতিমার চালচিত্রের পিছনে দুটো ছোট ছোট হাত আগলে ধরে রেখেছে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে, এতসব আওয়াজেও তার ঘুম ভাঙছে না। দেখে মনে হচ্ছে, শরীরটা একেবারে নিস্তেজ বহুদিন ধরে ঘুম হয়নি। সুপ্রভা এগিয়ে গেল তার মাথায় হাত বুলিয়ে ছোট্ট মেয়েটির ঘুম ভাঙালো। সুপ্রভা মনে মনে বোধহয় এইবার রহস্য ভেদ করতে পারল। সে বলল এতদিনে তার দুর্গাপূজো সার্থকতা লাভ করল তার রান্না করা ভোগে সত্যি মায়ের ক্ষুধা নিবারণ হল।

গ্রামের সবাই এক একজন এক একটা প্রশ্ন করতে শুরু করল। কিন্তু মেয়েটি চুপ করে সুপ্রভার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুই যে বলতে পারছে না, হাত পা রুক্ষ হয়ে আছে, চোখ দুটো ছলছল করছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব ভয় পেয়ে আছে। সকলকে চুপ করতে বললেন রামতনুবাবু। অনেক ভেবেচিন্তে রামতনুবাবুর মনে পড়ল পুজোর কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া চরম বন্যা বিপর্যয়ের কথা। তিনি ভাবলেন, এই মেয়েটিকে এই অবস্থায় বেশি প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। সে ছোট, তার যত্নের প্রয়োজন, স্নেহের প্রয়োজন, আদরের প্রয়োজন। তিনি কঠোরভাবে বলে দিলেন - "ও আমার গৌরী। আজ মায়ের বিসর্জন না বোধন।" সুপ্রভা ওকে নিয়ে ঘরে গেল। মায়ের বোধনের শঙ্খ বেজে উঠল, সবাই একই সাথে বলতে লাগল- "গৌরী এলো, গৌরী এলো।"

আমি দুর্গা আমি পরিত্যক্তা

সুচরিতা দত্ত

দীপা খবরটা জানা মাত্র দৌড় দিয়েছে, তার শুনে এত আনন্দ হয়েছে যে আর কিছুতেই অপেক্ষা করতে পারছে না। এক্ষুনি সে সব্বাইকে বলবে। সে দৌড়ে দৌড়ে পুকুরের ধারে গেল। ওখানে পাড়ার কাকীমা-জ্যেঠিমারা ছিল। তারা তো দীপাকে দৌড়ে আসতে দেখে বলছে, "আরে পড়ে যাবি, পড়ে যাবি রে—দৌড়াসনি। আরে থাম, বাবা থাম।" দীপা তখন বলতে শুরু করল, "খবর শুনেছো কাকী আমার একটা বোন হয়েছে গো। সে নাকি এক্কেবারে মা দুগ্গার মত দেখতে!" কাকী বলে, "তা এত আনন্দ করছিস যে বড়, তোর আদর এবার কমলো বলে।" দীপা বলে, "কাকী তুমি যে কি বলো না! বোনকে আমি আদর করবো। সব সময় আমার কাছে রাখবো, আর মা বাবা আমাকে আদর করবে।" এই বলে সে আবারও সারা পাড়ায় আনন্দের খবর দিতে বেরিয়ে পড়ল।

দীপা বোনের একটা নাম ঠিক করেছে, জয়া। হ্যাঁ, এই জয়াই দীপার ছোট বোন, নামটা বাবা-মায়েরও বেশ পছন্দ হয়েছে। জয়া বাড়ির ছোট মেয়ে তাই বাড়ির সবাই আদর করে তাকে 'খুকি' বলেই ডাকে, আজ তার বয়স ১৫ হয়েছে। সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। আর তিন মাস বাদেই তার মাধ্যমিক পরীক্ষা। জয়া কিন্তু বেশ মেধাবী এক ছাত্রীও বটে। সে যে কটা ক্লাস পেরিয়ে আজ দশম শ্রেণীতে পড়ছে, তার প্রতিটা ক্লাসেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত। জয়ার মনে একটা দুঃখ ছিল এ বিষয়ে কেন প্রথম হতে পারত না সে। যাই হোক, এখন জয়ার শুধু একটাই লক্ষ্য, তাকে রাজ্যের মধ্যে একটা র‍্যাঙ্ক করতেই হবে। এদিকে দীপা বেশ বোনের খেয়াল রাখছে যেহেতু বোন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাই জন্য তার বোনের পড়া ধরছে, সময়ে সময়ে খাইয়ে দিচ্ছে। হাতের কাছে সমস্ত কিছু এগিয়ে দিচ্ছে, এমনকি টিউশনিতেও দিয়ে আসা আবার রোজ নিয়ে আসা বলতে গেলে সবকিছুই করছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন হল এক বিপত্তি, দীপা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল; এতটাই অসুস্থ যে বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারতো না। কিছুদিন বাদেই ছিল দীপার B.A 5th sem -এর পরীক্ষা, দীপা সেটা দিতে পারল না। এদিকে তার বোনকেও সবকিছু একাই করতে হচ্ছে, একাই টিউশনে যেতে হচ্ছে, টিউশনি থেকে ফিরতে হচ্ছে। তার মায়ের হাঁটুর ব্যথার কারণে তার মাও তাকে দিয়ে আসতে পারেনা, তার বাবা তো বাইরেই থাকে কাজের জন্য, আসে সপ্তাহে একদিন। রাত দশটার সময় জয়াকে টিউশন শেষ করে একাই ফিরতে হচ্ছিল। একা বলা ভুল হবে সে আসলে তারই বন্ধু সুজয়ের

সাথে ফেরে, কিন্তু বাড়ির সবাইকে বলেছিল যে, সে তার বান্ধবী মীনাক্ষীর সাথে যাতায়াত করছে এমন ভাবে চলতে থাকল সময়।

একদিন পড়া শেষে ফেরার পথে জয়ার সামনে হঠাৎ সুজয় হাঁটু গেড়ে বসে একটা লাল গোলাপ আর চকলেট নিয়ে জয়াকে বলল, "জয়া আমি তোকে অনেকদিন ধরে একটা কথা বলব বলব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারছিলাম না। সব সময় তোর সাথে দিদি থাকতো কিন্তু আজ সুযোগ পেয়েছি, তাই আজ বলছি। 'I Love You' জয়া, আমি তোকে খুব ভালোবাসি। আমার সাথে প্রেম করবি?" জয়া তো ভীষণ অবাক, একটু ভীত ছিল জয়া। বলল, "না সুজয় এসব কি বলছিস তুই! আমরা শুধু ভালো বন্ধু, এসব হয় না। আমি কখনো তোকে সেই নজরে দেখিনি তুই এসব রাখ আর কোনদিন এসব যেন না দেখি, যদি বলিস তো তোর আমার বন্ধুত্ব সেদিনই শেষ। এখন তো সামনে আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা সেদিকেই লক্ষ্য দে, এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাস না।" কিন্তু সুজয় তো মানতে নারাজ। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ার হাতটা চেপে ধরে বলতে শুরু করল, "না জয়া আমি তোকে ভালোবাসি। আমার সাথে তোকে প্রেম করতেই হবে। তুই 'হ্যাঁ' না বললে আমি তোকে কিছুতেই আজ বাড়ি যেতে দেব না, আমি নিজেও বাড়ি যাব না, তোর হাতও আমি ছাড়বো না" বলে জোর করে হঠাৎ জয়ার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমু খেতে থাকলো আর জয়া ভীষণ ভয় পেয়ে সুজয়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ির কাউকে এই কথা জয়া বলতে পারলোনা। সারাটা ক্ষণ মন-মরা হয়ে থাকে। বইও পড়ে না, মা 'কী হয়েছে' জিজ্ঞাসা করলে বলে কিছু হয়নি। দিদিকে শুধু জড়িয়ে ধরে বলে, "তুই কবে সুস্থ হবি রে দিদি? আবার আগের মত আমায় টিউশনে দিয়ে আসবি, নিয়ে আসবি!" দিদি বলে, "হয়তো মরেই যাব"। তখনই বোন দিদির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, "এমন কথা মুখেও আনবি না দিদি, আমি কিন্তু খুব রেগে যাব" এই বলে দুজনেই গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে থাকে।

সুজয় প্রতিনিয়ত তাকে বিরক্ত করছে বলে সে আজ স্যারকে বলল, "স্যার আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন? আমি বাড়িতে যাব, আমার একটু তাড়া আছে।" স্যার সেই মতো তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়েও দিল। অনেকটা এগিয়ে এসেছে জয়া, কিন্তু সুজয়ও তেমন ভাবেই তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে তার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। বলছে, "জয়া একটু দাঁড়া, একটু দাঁড়া জয়া, তুই এইভাবে আমাকে এড়িয়ে যেতে পারিস না রোজ রোজ।" তখনই হঠাৎ জয়ার পাশে একটা সাইকেলের বেল বেজে উঠল। জয়া বললো, "অমিতদা তুমি?" এই অমিতের কথা একটু বলে রাখি, উনি হলেন দীপার বয়ফ্রেন্ড, না এটা বলা ভুল। এখন যদিও দীপার আর অমিতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যেত কিন্তু জয়ার পরীক্ষার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমিত ছেলেটা অতটাও ভালো নয়, কেমন যেন! এই জয়ার দিকে একটু বাঁকা নজরে দেখে, জয়া যদিও প্রথম প্রথম সেটা বুঝতো না, কিন্তু এখন খানিকটা হলেও বোঝে তাই এড়িয়ে চলে। আজ যখন অমিত বলল, "শালী আধি ঘরওয়ালি কী ব্যাপার? পড়তে নাকি?" জয়া বলল, "হ্যাঁ, এই ফিরছি। অমিত বলল, "তো চলে এসো, আমি তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।" প্রথমে জয়া না বললেও দূরে সুজয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাধ্য হল অমিতের সাইকেলে উঠতে। কিন্তু অমিতের সাইকেলের সামনে বসতে হল তাকে। কারণ সাইকেলের পিছনে ক্যারিয়ার নেই। কিন্তু সেখানেও হল এক মহা বিপত্তি। অমিত সুযোগ ছাড়লো না। সাইকেল চালাতে চালাতে তার যতটা সম্ভব গায়ে গা ঘষতে চেষ্টা করল। গা ঘষলোও, শুধু তাই নয় একবার তো প্রায়ই পড়ে যাওয়ার অভিনয় করে তাকে জড়িয়ে ধরার সুযোগটাও ছাড়লো না। জয়া পড়লো মহা অস্বস্তিতে। এইভাবে সে বাড়ি পৌঁছে গেলেও তার শরীরের মধ্যে ঘিনঘিন করতে লাগলো। আর জন্মালো পুরুষের প্রতি ঘৃণা, তীব্র ঘৃণা। কিন্তু এবারও এই ঘটনা বাড়ির কাউকে সে জানাতে পারলো না। কারণ সে তো মেয়ে। তাকে খারাপ বলবে সবাই, শুধু তাই নয় তার পড়াশোনাটাও হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই জয়া চুপ করেই থাকলো। বলতে গেলে একেবারেই শান্ত হয়ে গেল। বাড়ির কারোর সাথে আগের মত কথা বলে না, মেলামেশা করে না। সব সময় মনমরা হয়ে থাকে। নিজের ঘরে বইয়ের সাথে চুপচাপ পড়ে থাকে।

এইভাবে চলতে চলতে এলো জানুয়ারি মাস। পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই, জয়ারও পড়াশোনা প্রায় সব কমপ্লিট। শুধু বারবার রিভাইস চলছে, তাই জয়ার স্যার তার সকল স্টুডেন্টকে বলেছিল, "তোদের তো সামনে এক্সাম এসে গেল, অনেক পড়াশুনা করেছিস। একটা দিন ছোট্ট করে একটা পিকনিক করবো ভাবছি তা সবাই রাজি তো? এতে কিন্তু তোদেরও বেশ মাইন্ডটা ফ্রেশ লাগবে, পড়ায় মনোযোগ আরও বেশি বাড়বে।" সবাই 'হ্যাঁ' বলে লাফিয়ে উঠলো। স্যার বলল, "আচ্ছা বেশ, তাহলে ওই জোড়া মন্দিরের পেছনের যে একটা লিচু বাগান আছে, ওই লিচু বাগানে সবাই একসাথে মিলে পিকনিক করবো ঠিক আছে?" সবাই বলল, "হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে।" কিন্তু শুধু জয়াই যেতে চাইলো না ওই পিকনিকে, সুজয়ও যাবে এটা ভেবে। কিন্তু বন্ধুরা তো আর ছাড়বার লোক নয়। তার বন্ধুরা তাকে রীতিমতো জোর-জবরদস্তি করেই রাজি করিয়ে নিল। সামনের রবিবার, তাদের পিকনিক। সবাই সকাল ন'টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে যাবে এটাই ঠিক হল।

আজ সেই দিন, সেই রবিবার, সেই পিকনিকের দিন। বেশ তাড়াতাড়ি জয়া আজ ঘুম থেকে উঠেছে সকাল সকাল স্নান-টান সেরে এখন সে রেডি হবে। জয়ার রূপের কথা খানিক জানিয়ে রাখি। আমাদের জয়া কিন্তু বেশ সুন্দরী, মিষ্টি চেহারা, মায়াবী চাহনি, বেশ লম্বা চুল, হাসলে মুখে খানিক টোল পড়ে। আর আজ তার উপর পরেছে একটা গাউন, ঠোঁটে দিয়েছে হালকা গোলাপি রঙের

লিপস্টিক, ঠোঁট দুটো অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। কপালে ছোট্ট কালো টিপ, চোখে বেশ মোটা করে কাজল, কানে পরেছে দুটো ছোট কানের দুল । জয়া এখন সম্পূর্ণ তৈরি। পিকনিকে যাওয়ার আগে সে মা-বাবা আর দিদিকে 'আসছি' বলতে এল। জয়ার মা বলল,"খুকি সাবধানে যাস, আর কখন ফিরবি রে মা?" জয়া বলল, "সন্ধ্যের মধ্যে চলে আসব।" বাবার কাছে গেলে বাবা বলল, "সাবধানে যাস মা।" দিদি বলল, "কই রে বোন, কই দেখি কেমন লাগছে? খুব সুন্দর লাগছে! দেখিস কেউ যেন আবার তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে না করে নেয়।" বোন মানে জয়া বলল, "ধ্যাত কি যে বলিস না তুই! চুপ কর আর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ। আমি এখন আসলাম। তুই সময় মতো ওষুধগুলো খেয়ে নিস, টাটা দিদিভাই"- বলে বিদায় নিল জয়া।

পিকনিকে প্রায় জয়ার সব বন্ধুই উপস্থিত। নিশা, মীনাক্ষী, বিদিতা আরও অনেকে। আর সেই সুযোগ এসেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ খুব চেনা সুরে তার নামটা শুনেই অবাক হয়ে পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠলো জয়া। বলল, "একি তুমি এখানে কি ব্যাপার?" উল্টোদিকের ব্যক্তি বলল, "তোমার গন্ধে এখানে এসেছি।" জয়া চুপ করে রইল। উল্টোদিকের ব্যক্তির পাশ থেকে স্যার বলে উঠলো, "কি ভাই, তুই জয়াকে চিনিস নাকি?" বলল, "আরে ভাই কি বলিস! ও তো আমার আধা বউ রে! ওকে চিনব না।" স্যার তো অবাক। বলল, "এরই কথা তুই একবার আমাকে বলেছিলিস না, এ কি তবে সেই?" উল্টো দিকের ব্যক্তি বলল, "হ্যাঁ রে ভাই! এই সে, যার কথা বলেছিলাম।" বলে দুজন দুজনের দিকে চোখ মারল, তারপর হাসতে শুরু করল। তারপর জয়া যখন ওখান থেকে চলে যাচ্ছিল তাকে স্যার থামিয়ে বলল, "আরে জয়া চলে যাচ্ছিস যে! শুনে যা।" জয়া বলল, "কী স্যার?" স্যার বলল, "জয়া তোকে কিন্তু আজ বড্ড বেশি ভালো লাগছে। তুই সবসময়ই ওই ঢলাঢলা পোশাক পরিস। আজ এই পোশাকটা পরে তোকে মানিয়েছে কিন্তু দারুন।" জয়া বলল, "স্যার এসব কী বলছেন আপনি?" স্যার বলল, "আরে আজ ওসব রাখ তো! অত 'স্যার-স্যার' করতে হবে না, আমি আজ স্যার নই তোর। বন্ধুর মত কথা বল আমার সাথে এমনিতেও তোর এই লোকটি আমার বন্ধু হয়।" জয়া আর কিছু বলতে পারল না চুপচাপ চলে গেল। আর উল্টোদিকে স্যার আর সেই স্যারের বন্ধু হাসতে থাকলো। বলল, "হেব্বি লজ্জা পেয়েছে মেয়েটা বুঝলি! তা আমাদের স্বপ্নটা আজ পূরণ হবে নাকি? করবি নাকি পূরণ? আজ কিন্তু একটা সুযোগ আছে।" বন্ধু বলল, "বেশ ভালই হয় কিন্তু তবে।" দূর থেকে জয়া লক্ষ্য করল জয়ার দিকে তাকিয়েই স্যার আর স্যারের বন্ধু অর্থাৎ জয়ার সেই পরিচিত ব্যক্তি বোধহয় জয়াকে নিয়েই কিছু বলা-বলি করছে, কারণ বারবার কথা বলতে বলতে তার দিকেই তাকাচ্ছিল তারা। একবার তো জয়া হঠাৎ দেখে তার স্যার তার দিকে তাকিয়ে চোখ মারল আর নিজের জিভটা ঠোঁটে ঘষে নিল। জয়া তো রীতিমতো অবাক। সে জানতো না তাদের স্যারও এমন ধরনের। আরও ভাবতে থাকল, "আমার সাথে কেন এমন হচ্ছে? কেন হয় আমার সাথে এমন?" এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন মজাদার অনুষ্ঠান, হাসি-ঠাট্টা, বিভিন্ন পদ ভোজনের মধ্য দিয়ে সেদিনের বেলা ফুরোলো ও সন্ধ্যে নেমে এলো। পিছন থেকে সুজয় জয়াকে ডেকে বলল,

"জয়া বাড়ি চল। আমি বাড়ি যাচ্ছি, তোকে বাড়ি দিয়ে আসছি।" জয়া বলল, "তুই ভাবলি কী করে? এত কিছুর পরেও আমি তোর সাথে বাড়ি যাবো? আমি একা যেতে পারবো, আমার সাথে তোর যেতে হবে না।" এইভাবে সুজয়ের সাথে জয়ার বাকবিতণ্ডা শুরু হল।

"বীমা, ফিঙে, গণশা তোরা তাড়াতাড়ি আয়। দেখ এখানে কোন একটা মেয়েমানুষ পড়ে আছে বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আয়। কেমন ভাবে রক্ত ছড়িয়ে আছে! ইশ রে! ভগবান কার কপাল পোড়ালে তুমি? কার কোল খালি করলে এইভাবে?"

একটা ধানক্ষেতের ধারে জলাভূমিতে পাওয়া যায় একটা নামহীন পরিচয়হীন রক্তাক্ত বালিকার দেহ। যার গলায় আঁচড় দেওয়ার দাগ, বক্ষদেশে আঁচড়ের বিশ্রী দাগ, নিম্নাঙ্গ অচেতনভাবে খোলা, ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে হয় কেউ খুপলে তুলে নিয়েছে। পেটে, নাভিতে, থাই-এ অজস্র আঁচড়ের দাগ। বলতে গেলে, মেয়েটির শরীরটাই ছিল অর্ধনগ্ন আর অজস্র কাঠ পিঁপড়ে আর গুড়ি পিঁপড়ে তাদের ভোজের জন্য মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির শরীর থেকে। তার সাথে অজস্র মাছিরা ভনভন করছে ওই মৃত শরীরের রক্তের স্বাদ নেওয়ার জন্য।

অকাল বোধন

স্বস্তিকা ভট্টাচার্য

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল তিয়াশা। আজকে তার বিশেষ কোনো বন্ধু ছিল না। তাই একাই বাড়ি ফিরতে হচ্ছিল তাকে। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে

বলল, "কি মামনি চললে কোথায়?" আরেকজন পাশ থেকে বলে উঠলো, "আজকে জব্বর মাল পেয়েছি, মজা হবে"- তিয়াশা ভয়ে সিটিয়ে গেল। কী যে করবে, কিছুই বুঝতে পারল না। ঠিক সেই সময়েই রাস্তা দিয়ে একটি অচেনা মেয়ে যাচ্ছিল। সে সব শুনে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলো, "কি ব্যাপার, খামোখা এরকম উত্যক্ত করছেন কেন? এই কি আপনাদের ভদ্রতা? এটা শুনেই লোকগুলোর মধ্যে একজন এগিয়ে এলো আর বলল, "থামুন দিদি, বেশি কথা বলতে গেলে না—আপনার অবস্থাও সিধে করে দেব"। বলতেই মেয়েটি ছেলেটির গালে একটি থাপ্পর কষিয়ে দিল। ছেলেটি তখন মেয়েটিকে আক্রমণ করল। কিন্তু একি? মেয়েটার ক্যারেটের প্যাঁচে লোকটা পাঁচ মিনিটেই ধরাশায়ী হয়ে গেল। এরপর একে একে বাকি ছেলেগুলোকেও ধরাশায়ী করে দিল সে। দিয়ে তিয়াশাকে বলল, "ভয় পেয়ো না বোন, আমি আছি তোমার সাথে। আমার নাম অর্চিতা ঘোষ। ক্যারাটে ব্ল্যাকবেল্ট। আমার নম্বরটাও চাইলে নিয়ে রাখতে পারো। পরে কোনো বিপদে পড়লে আমাকে জানাবে, আমি বাঁচানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।" তিয়াশা বিস্মিত, হতবাক! শুধু "ধন্যবাদ দিদি", ছাড়া আর কিছুই বলল না। তার মুখ থেকে যে ভাবলো, একটা মেয়ের গায়ে এত জোর কীভাবে থাকতে পারে, সে কি তবে দেবী দুর্গা? স্বয়ং দেবী দুর্গা কি বাঁচাতে এসেছিল তাকে? কিন্তু 'অকালবোধন'টা কে করল তবে?

গোল

সম্প্রীতি দে

আরে ডান দিক— ডান দিক পাস কর আমাকে, পাস কর, গোল হবে, গোল দেবো দে দে দে... গোল!!!!!

"ও দাদা, আপনার স্টপ এসে গেছে শোভাবাজার মেট্রো— দিন, দশ টাকা দিন।"

অভীক রাস্তায় বাস থামার সাথে সাথে এক চোট বোকামি করে ফেলল। কন্ডাক্টরের ডাক শোনার পর কিছুটা বিরক্ত, ক্লান্ত ও অবাক মনে পাঁচ টাকার নোট কন্ডাক্টরের হাতে তুলে দিল। দিন দশেক ধরে অভীকের মন ভালো নেই। মা-বাবা বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে, ইভাও ঠিকমতো বুঝতে চাইছে না। ঠিক কী বুঝতে চাইছে ইভা? আজকাল অভীকও বুঝতে পারছে না। মনে মনে ভাবতে ভাবতে অভীক বাস থেকে নেমে পড়ল। দূরে যুবসংঘ ক্লাবের মাঠে বাচ্চারা ফুটবল প্র্যাকটিস করছে, অভীক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে হঠাৎ এক ধরনের শান্তি আর হাসি ফুটে উঠল, যেন সে ১২ বছর আগে ফিরে গেল—

দিনটা ছিল ১৫ই আগস্ট। যুবসংঘ ক্লাবের বার্ষিক টুর্নামেন্ট চলছে, গোটা পাড়া প্রায় পূর্ণ লোকজন। চার দিন সকাল-বিকেল খেলা চলেছে। তারুণ্য এবার ক্যাপ্টেন, ভোলা অসাধারণ গোলকিপার, জয় আর শুভ সাইডে খেলবে, আর অভীক? অভীক স্ট্রাইকার। সকালে খেলা শেষ হল, অভীকরা মোহনগড়ের কাছে হারলো, সবার মন একটু খারাপ। তার মধ্যে তারুণ্যদা আর পৃথাদির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তাই তারুণ্যের মন বসছে না। সে তেমন কিছু বলল না, শুধু বলল, "কি আর করব! আগে তো শুধু বেকার ছিলাম, এখন বেকারের সাথে অযোগ্যও প্রমাণিত হলাম।" বোঝা গেল, তারুণ্য ঠিক নেই।

পঞ্চানন কাকু কোচ; বললেন, "তারুণ্য, তুমি আজ রাখো, তোমার জায়গায় অভীককে ক্যাপ্টেন বানিয়ে দি আর অভীকের জায়গায় রবিকে দাও। কি বলো!" তারুণ্য বলল, "তুমি যা ভালো বোঝো"- বলে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পৃথাদির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যদিকে অভীকের মন ভালো নেই আজ। ছোটোবেলার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তার প্রথম ভালোবাসা আজ চলে যাচ্ছে, হয়তো আর দেখা হবে না। অভীক ক্লাস টেনে পড়ে। চিনিকে বলেছে তার মনের কথা। চিনি বলেছিল আজ উত্তর দেবে। কিন্তু কাল রাতে জানালো— চিনি চলে যাচ্ছে, তার বাবা ট্রান্সফার হয়ে

গেছে। চিনি আজ একবারও ডাকেনি। মনটা খুব খারাপ, এতক্ষণ কী হয়েছে কিছুই শোনেনি। পঞ্চানন কাকু বললেন, "কি গো অভীক, পারবে তো? তোমার ওপর কিন্তু টিমের দায়িত্ব!"

অভীক এবার একটু চমকে উঠল। বলল, "আমি? কিন্তু তারুণ্যদা তো সেরা, আমি কী পারব?" "হ্যাঁ, তুই পারবি, ছোট হলেও পারবি, মনে রাখবি তুই নিজের জন্য না, তোর পাড়া'র জন্য খেলছিস।" বলল পৃথাদি। ভালো লাগল, কিন্তু ভয়ও লাগছে। এবার আর কোনো উপায় নেই, শেষ খেলায় আমাদের নাম ডেকেছে- যেতেই হবে। অভীকরা সবাই মাঠে নামলো ক্যাপ্টেনসির ভার ওর ওপর। বিপরীতে মিলন সমিতি খুব রাফ খেলছে। ওই টিমের রোহিত, অভীকের চিরদিনের শত্রু। সারাজীবন তার সাথে প্রতিযোগিতা করেছে। সেবার, চিনি যখন স্কুল থেকে ফিরছিল সাইকেলে করে, চিনিকে দেখে রোহিত কুমন্তব্য করেছিল। অভীকের মাথা গরম হয়ে গিয়ে সাইকেল ছেড়ে মারতে গিয়েছিল রোহিতকে। রোহিতের মাথা ফেটে গিয়েছিল, তারপর মা-বাবার মধ্যে অনেক ঝামেলা। আজ সে সেই রোহিতেরই বিপক্ষে। "না। এবার জিততেই হবে। চিনি নেই কিন্তু চিনি'র জন্যই জিতবো"— মনে মনে বলল অভীক।

ওদিকে চিনির যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সে অভীককে ছেড়ে থাকতে পারে না। ছোট থেকেই অভীক-ই যেন সবকিছু। চিনি'র মা নেই, অভীকের মায়ের কাছেই বড় হয়েছে সে। যখন ওর ৩ বছর বয়স, ও বাবা-মায়ের সাথে আসে এখানে, তখন থেকেই অভীকরাই ওদের সব। চিনি আজ সকাল থেকেই অভীককে আর ডাকল না। অভীকও তো ডাকল না খেলতে যাওয়ার আগে। চিনি ভাবলো - "এখনও কি রাগ করে আছে? ওকে কি জ্যেঠিমণি বলে দিয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি? আমি তো নিজের মুখে বললে কষ্ট পাবে তাই বলিনি। ধুর! ভালো লাগে না।" ও ভাবল জ্যেঠিমণির কাছে যাবে।

দৌড়ে অভীকের মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "ও জ্যেঠিমণি অভীকদা কখন আসবে?" চিনি বলল, "অভি তো মাঠে। আজ সকাল থেকে কোনো কথা বলছে না, কাল রাতে শোনার পর থেকে। কী করে রাখি বল তোকে আমি, তুই তো আমার অভ্যাস।" অভীকের মায়ের চোখে জল। চিনি চলে গেল মাঠের দিকে।

শেষ তিন মিনিট বাকি, আরেকটি গোল দরকার। ফাইনালের দুটি টিম যুবসংঘ ও মিলনসমিতি। চিনি এসে কোনো মতে মাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গিয়ে দেখে অভীকের কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। চিৎকার করে বলল, "অভি, গোল দাও, পারবে তুমি।" অভীক নিমিষের মধ্যে একবার চিনিকে দেখে নিয়ে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রবি পাস করল বলটা, আর অভীকের ডান পা দিয়ে সোজা গোল পোস্টে গোল ... গোওওওল!!!

অভীক মাটিতে বসে পড়ল যেন তার পুরো জীবন সফল। রোহিতরা টিমে এত মারপিট করেও অভীককে বলতে বাধ্য হল তার খেলার দুর্ধর্ষতা। সবদিক থেকে আজ অভীকই হিরো। কিন্তু অভীক শুধু চিনিকে দেখছে, যেন ও তার জীবনে জয়ী হয়েছে। ওর মন বলছিল, চিনি তাকে ভালোবাসে। চিনি আজ মাঠে আসবেই। তার চোখের জল আর মুখের হাসি-ই তার প্রমাণ।

আজ মাঠের দিকে তাকিয়ে তার মুখের হাসির কারণ এক মেয়ে শাড়ি পরা, চুল আলগা করে খোঁপা করা, কপালে ছোট্ট টিপ। ঠিক তখনই চিনির কথা মনে আসলো ওর। সে বলেছিল সে চলে যাচ্ছে কিন্তু যখন ফিরে আসবে তখন এইভাবে ফিরবে। তাতে কোনো অসুবিধা হল না অভীকের চিনতে যে এটা চিনি। শান্তভাবে পাশে দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে, "জ্যেঠিমণি, কেমন আছেন?"

"ভালো"

"আর তুমি অভি?"

"এবার থেকে থাকবো...।"

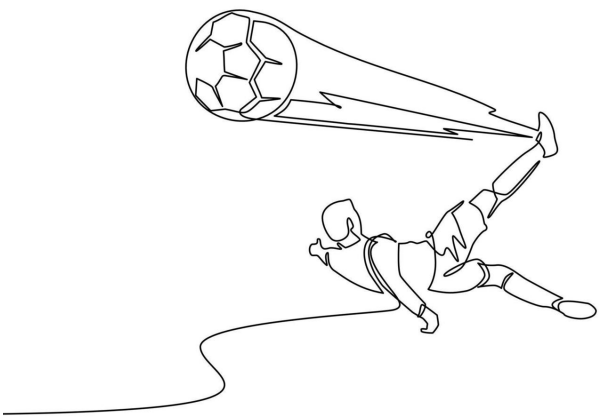

খেলার ছলে

শব্দবাণ

সূত্র ধরে পাশাপাশি ও উপর-নীচে শূন্যস্থান পূরণ করো

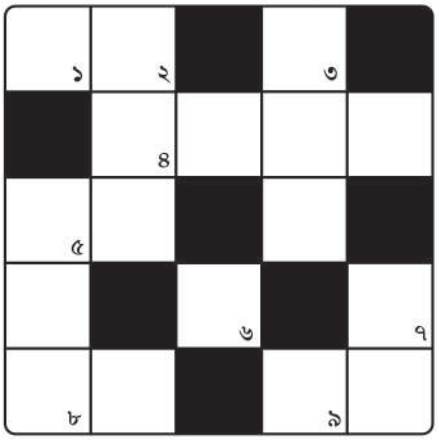

পাশাপাশি

১. সন্ধ্যা
৪. যা মেলানো যায় না
৫. গ্রাম বা শহরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষ
৮. হাস্যকৌতুক-কারী অভিনেতা
৯. জয়নগরের বিখ্যাত মিষ্টি

উপর-নীচ

২. বিবাদ/কলহ
৩. জলে ____, ডাঙ্গায় বাঘ।
৫. জন্মদিনে মিষ্টি মুখ
৬. সংগীতে সপ্ত স্বরের মধ্যে চতুর্থ স্বর
৭. পাখি বিশেষ

সুদোকু

	6	9	7	5	2	3	8	
	5	2				7	1	
7								2
6	9			1				7
3				9		5	2	8
		4	3					
	1	6						
		8	9	4	3		7	1
4		7		8				

প্রতিটি সারি, স্তম্ভ এবং নয় ঘরের খোপে একটি সংখ্যা একবারই থাকবে। অজানা সংখ্যাগুলি পূরণ করো

তফাৎ চেনো

নীচের ছবি দুটির মধ্যে ৮টি পার্থক্য খুঁজে বের করো

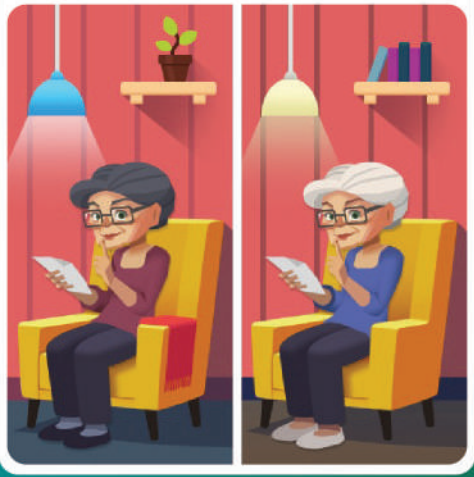

খেলার ছলে অঙ্ক কষো

শূন্যস্থান গুলিতে +, −, ×, ÷ বসিয়ে সমীকরণটি সম্পূর্ণ করো

৭		৮		৬	=	৩৬		২১
=		=		=		=		=
৭		১		৩		৬		৩
৭		৮		৪		৩২		৮
৪৯		৮		২৪		৪		২

ছবি দেখে শব্দ লেখো

সূত্র ধরে পাশাপাশি ও উপর-নীচে শূন্যস্থান পূরণ করো

১			
২			
৩			
৪			

পাশাপাশি

১

২

৩

৪

উপর-নীচ

ছবি দেওয়া আছে নম্বরসহ। ছবিগুলো দেখে এবং ভেবে সেগুলো আসলে কী, তার বাংলা নাম পরপর বাক্সতে ভরে ফেলো। সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে একটা সুন্দর শব্দ তৈরি কর। দেখতো শব্দটা পাও কিনা!

উপকরণ: রঙিন কাগজ (সবুজ ও লাল), ১ টি স্ট্র, আঠা, সেলোটেপ, পেনসিল, রং

Step 1 - সবুজ কাগজটিতে একটি বড় গোল কেটে নেব।

Step 2 - গোলটিকে মাঝখান থেকে দু ভাঁজ করব এবং গোলটির মাঝখানে কাঁচি দিয়ে একটি ফুটো করে নেব।

Step 3 - এরপর সবুজ কাগজে আরও দুটি ছোট গোল কেটে তার ওপর কালো রং দিয়ে চোখ আঁকবো।

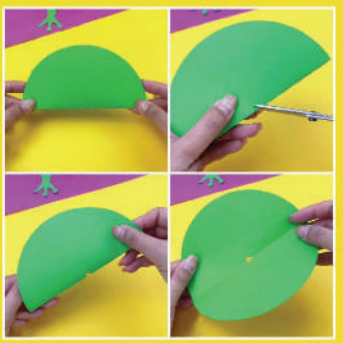

Step 4 - চোখ দুটিকে হাফ সারকেল (Half Circle) -এর উপরের দিকে লাগিয়ে দেব এবং রং দিয়ে ব্যাঙের দুটি নাক এঁকে দেব।

Step 5 - সবুজ কাগজে ব্যাঙের পায়ের মতো আকারের দুটি অংশ কেটে নেব।

Step 6 - পা দুটি গোলের নীচের দিকে লাগিয়ে দেব।

Step 7 - একটি লাল কাগজ লম্বা করে কেটে নেব, তার চারধারে আঠা লাগিয়ে দেব।

Step 8 - তার মধ্যে একটি স্ট্র দিয়ে অর্ধেক করে ভাঁজ করে নেব।

Step 9 - পেন্সিল দিয়ে লাল কাগজটিকে গুটিয়ে নেব।

Step 10 - সবুজ গোলটির মধ্যে করা ফুটোটির মধ্যে দিয়ে স্ট্র-টি গলিয়ে দেব এবং আঠা বা স্যালোটেপ দিয়ে লাগিয়ে দেব।

তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের জিভ বের করা কোলাব্যাঙ! সাহায্যের জন্য পাশে ছবি রইলো।

টাটকা টাটকা : অলিম্পিক ২০২৪-এ ভারত

খেলাধুলা- শুটিং
ইভেন্টস- ১০ মিটারে এয়ার পিস্তল (মহিলা)
প্রতিযোগীর নাম- মনু ভাকের
পদক ও তারিখ - ব্রোঞ্জ, ২৮শে জুলাই

খেলাধুলা- শুটিং
ইভেন্টস- ১০ মিটারে এয়ার পিস্তল (মিশ্র)
প্রতিযোগীর নাম- মনু ভাকের, সরব জ্যোত সিং
পদক ও তারিখ - ব্রোঞ্জ, ৩০শে জুলাই

খেলাধুলা- অ্যাটলেটিক্স
ইভেন্টস- জ্যাভলিন থ্রো (পুরুষ)
প্রতিযোগীর নাম- নীরজ চোপড়া
পদক ও তারিখ - সিলভার, ৮ই আগস্ট

অলিম্পিক সম্পর্কে আরো পড়ুন ১০-এর পাতায়

ফ্রেমবন্দী

অন্বেষা ঘোষ
প্রস্ফুটিত

অদ্রিজা কুন্ডু
রাঙা আলোয়

দোসর
সায়ন্তী সরকার

প্রেয়সী
আনোয়ার সেখ

দু চোখে তার পান্না বাহার
কৌণিক দে

রৌদ্রস্নাত
সম্প্রীতি দে

শহর জুড়ে যেন প্রেমের মরশুম
শুভ্রতনু সরকার

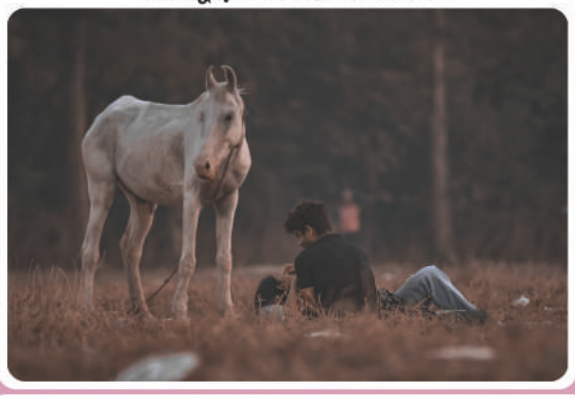

নন্দিনী নিয়োগী
কুয়াশাবৃত কলকাতা

সাহিত্য মজুমদার
শিকার

টাটকা টাটকা : অলিম্পিক ২০২৪-এ ভারত

খেলাধুলা- ফিল্ড হকি (পুরুষ)
প্রতিযোগীর নাম- হরমনপ্রীত সিং-এর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল।
পদক ও তারিখ - ব্রোঞ্জ, ৮ই আগস্ট

খেলাধুলা- কুস্তি
ইভেন্টস- ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি (পুরুষ)
প্রতিযোগীর নাম- আমান সেহরাওয়াত
পদক ও তারিখ - ব্রোঞ্জ, ৯ই আগস্ট

খেলাধুলা- শুটিং
ইভেন্টস- ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন
প্রতিযোগীর নাম- স্বপ্নিল কুসলে
পদক ও তারিখ - ব্রোঞ্জ, ১লা আগস্ট

অলিম্পিক সম্পর্কে আরো পড়ুন ১০-এর পাতায়

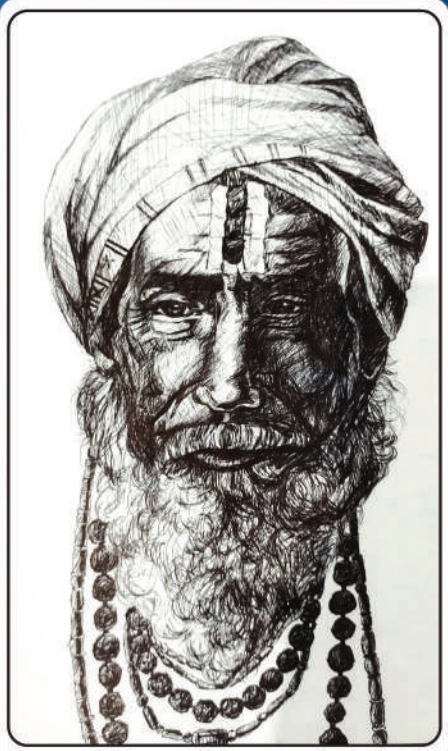

শুভাঙ্গী মুখার্জী
অষ্টম শ্রেণী

ইহিতা সরকার
পঞ্চম শ্রেণী

প্রাভিকা চক্রবর্তী
লোয়ার নার্সারি

সার্থক পুরকাইত
দ্বিতীয় শ্রেণী

শ্রীনিকা বোস
প্রথম শ্রেণী

সৃণিকা চক্রবর্তী
চতুর্থ শ্রেণী

অন্বিতা পুরকাইত
পঞ্চম শ্রেণী

স্নেহা ভট্টাচার্য্য
চতুর্থ শ্রেণী

সাদ্রিতা পাল
আপার নার্সারি

খুদেদের ক্যানভাস

শ্রীয়াংশু দাশগুপ্ত
পঞ্চম শ্রেণী

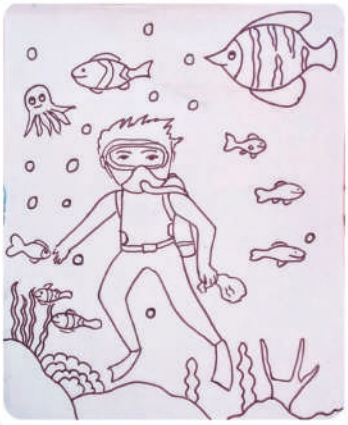

শ্রীয়া পাল
প্রিপারেটরি

ইভানা সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণী

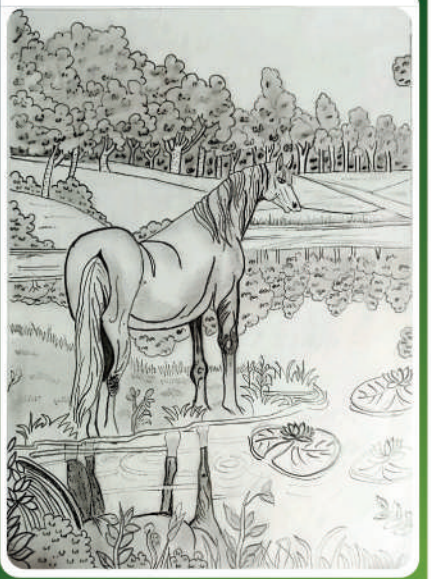

আরোশী হালদার
জুনিয়র কে.জি

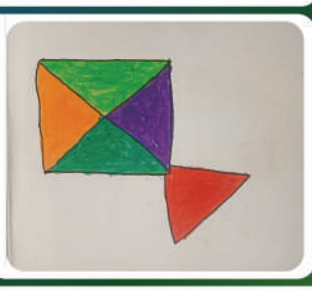

অনির্বান নস্কর
অষ্টম শ্রেণী

ঈশাঙ্ক সরকার
নার্সারি টু

বিনায়ক সরকার
তৃতীয় শ্রেণী

পৃথিকা চক্রবর্তী
পঞ্চম শ্রেণী

বিদিশা হালদার
সপ্তম শ্রেণী

জয়স্মিতা নন্দী
প্রথম শ্রেণী

ছোটদের কথা

সাত্যকি ভট্টাচার্য
পঞ্চম শ্রেণী, মজিলপুর জে.এম. ট্রেনিং স্কুল

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গাপুজো। সাদা মেঘের ভেলায়, কাশফুলের দোলায়, বাতাসে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ। শরতের এই আমেজ আমার খুব ভালো লাগে। দুর্গাপুজোর আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে জামাকাপড় কেনার একটা আলাদা মজা। শুধু কি আর কেনাকাটা? সঙ্গে থাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সারা বছর আমি এই দিনগুলোর অপেক্ষায় থাকি। আমাদের বাড়িতেই দুর্গাপুজো হয়। দূর দূর থেকে সব আত্মীয়রা আসেন। সবাই মিলে পুজো-বাড়িতে সময় কাটাই। সকালবেলায় থাকে অঞ্জলি, দুপুরবেলায় ভোগ খাওয়া। এরপর সন্ধ্যেবেলায় বাবা-মা ও দিদির সাথে কাছাকাছি ঠাকুর দেখতে বেরোই। এই দিনগুলোয় আমার খুব আনন্দ হয়। দশমীতে মায়ের বিসর্জনের পর আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেছে, এই বছর পুজোর পরে ভাইজাক ও আরাকু ভ্যালি নিয়ে যাবে। সামনে পুজো আর তারপর বেড়াতে যাওয়া, এখন সেই আনন্দই রয়েছে মনের মধ্যে।

প্রাভিকা চক্রবর্তী
লোয়ার নার্সারি, জে. এম. পাঠভবন

সামনে তো দুগ্গা পুজো। আমি নতুন জামা, নতুন জুতো পরে বাবা-মায়ের সাথে প্যান্ডেলে পুজো দেখতে যাব। তোমরা কি জানো প্যান্ডেলে গিয়ে আমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে দেখা হবে! কত জড়াজড়ি আর আদর হবে! আমরা একসাথে ছবি তুলবো, কত আনন্দ করবো, খেলবো, দুগ্গা মাকে নমো করবো। আমি তো জানি যে, দুর্গা মায়ের সাথে কার্তিক ঠাকুর, গণেশ ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুর থাকে। আর থাকে ময়ূর, ইঁদুর, হাঁস আর প্যাঁচা। মা দুগ্গা সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আর নীচে শুয়ে থাকে মহিষাসুর। আমি নতুন জামা পরে অঞ্জলি দেবো। তার সাথে ঢাকও বাজাবো। প্যান্ডেলে গিয়ে আইসক্রিম, ললিপপ খাবো। তার সাথে বেলুনও কিনবো অনেকগুলো। মা কিনে দেবে আমাকে। দুগ্গা মায়ের কাছে নমো করে আমি বলবো যে আমি যেন একটু একটু পড়াশোনা আর অনেক বেশি খেলা করতে পারি। তোমরাও পুজোতে অনেক মজা কোরো।

সৃনিকা চক্রবর্ত্তী
চতুর্থ শ্রেণী, জ্ঞানপীঠ শিক্ষায়তন

বর্ষার পরে আসে শরৎকাল। কালো মেঘের ঘনঘটা কাটিয়ে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর নীল আকাশ দেখা যায়। শরৎকাল মানে আমরা যা বুঝি বা জানি, তা হল দুর্গাপুজো। বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গাপূজা। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী আসলেই খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। কিন্তু পুজো আসছে এই কথাটা কেবলই বাঙালিদের মনে এক অন্য আনন্দ জাগায়। বাড়ির সবাই মিলে জামাকাপড় কিনতে গেলেই মনে হয় যেন পুজো চলে এসেছে। মহালয়ার অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠে মা-বাবার সাথে রেডিওতে যখন শুনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী, তখন মনে হয় দুর্গা মা যেন সত্যিই চলে এসেছে। দুর্গা মা যখন আসেন তখন সত্যিই মনে হয় যেন আমার মা আমার কাছে এসেছে। মহালয়ার ঠিক সাতদিন পর থেকে শুরু হয় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখার আনন্দ। যেমন ঠাকুর দেখা চলে, তেমনি চলে খাওয়াদাওয়া। ফুচকা, ঘুগনি, পকোড়া এসবের স্বাদ যেন লাগে অনন্য। স্কুল ছুটি থাকার সত্ত্বেও বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। অষ্টমীর দিন সকালে স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরে মা-বাবার সাথে প্যান্ডেলে যাই অঞ্জলি দিতে। আর তার ঠিক একদিন পরে আসে দশমীর বিষাদের সুর। মা যেমন এসেছেন, এবার তার যাবার পালা। সেইদিন আমার খুব মন খারাপ করে। কতদিন ধরে ভেবে রাখা আনন্দগুলো যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

আমার বাবা আমাকে বলেছে, "আমি যেন মন খারাপ না করি।" কেননা বাবা আমাকে না জানিয়েই অনেকদিন আগেই টিকিট কেটে রেখেছে পুরীর। তখন অল্প দুঃখ থাকলেও আনন্দটা অনেকটা হয়ে যায়। আবার আমরা তোড়জোড় করবো পুরীতে ঘুরতে যাবার।

জয়স্মিতা নন্দী
প্রথম শ্রেণি, শ্রীকৃষ্ণ এফ.পি.স্কুল

আমাদের বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা। তখন আমি ঘুরতে যাব। মা, বাবা আর মামারবাড়ির সবাইকে নিয়ে অনেক ঠাকুর দেখব। আমি আইসক্রিম খাব, অনেক নতুন নতুন জামা কাপড় কিনব। আমার দিদিভাইয়ের সাথে খুব মজা করব। খেলনা কিনব অনেক। সেদিন খুব আনন্দে কাটাব। আমি ও আমার পরিবার আনন্দে কাটাব। আমি খুব ভালো ভালো খাবার খাব কিন্তু যখন দশমী আসে তখন তো ঠাকুর ভাসান হয়ে যায়, আর আমার মন খারাপ হয়।

ছোটদের কথা

ইহিতা সরকার
পঞ্চম শ্রেণী, জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস

দুর্গা পুজোতে প্রত্যেক বছর আমার খুব আনন্দ হয়। বেশ কটা দিন পড়াশোনা করতে হয় না, বই খাতাগুলো একদম তাকে তোলা থাকে। আর তার সাথে নতুন জামা কাপড় তো আছেই। এখনো পর্যন্ত এই বছর আমার ১০টা জামা হয়েছে। মা, বাবা, কাকা, কাকীয়া, দাদু, জেম্মা, বড় মাসি, ছোট মাসি, মনি, ছোট পিসি এরা সব্বাই আমাকে জামা দিয়েছে। বারুইপুর থেকে আর কলকাতা থেকেও বাবা-মা কিছু জামা আমাকে কিনে দিয়েছে। আমাদের পাড়ার প্যান্ডেলের উদ্বোধন হয় পঞ্চমীর দিন। এই দিন কত বাজি ফাটে, কত মানুষ আসে, খুব মজা হয়। এই বছরও আশা করি তাই হবে। এরপর ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত পাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেক বছর আমি আর আমার বন্ধুরা এতে অংশগ্রহণ করি। নাচ, গান, আবৃত্তি আরও কত কি হয়। এই বছরও তাই করব। অন্যদিন যেহেতু খুব ভিড় হয়ে যায় তাই ষষ্ঠীর রাতেই ভেবেছি সবার সাথে গিয়ে ঠাকুর দেখে আসব। আমাদের জয়নগরে বেশ কিছু ভালো ভালো পুজো হয়। সেগুলো একেবারেই মিস করা যাবে না। সপ্তমীর দিন সকালে ঠিক করেছি একটু জয়নগরের বাড়ির পুজোগুলো দেখতে বেরোবো। দেখা যাক কি হয়! আর এবার তো শুনছি অষ্টমীর অঞ্জলি একদম ভোরে। কি জানি বাবা অত সকালে উঠতে পারব কিনা! কিন্তু উঠতে তো হবেই, অষ্টমীর অঞ্জলি না দিলে কি চলে? বাকি দিনগুলো বাড়ির সবাই আর বন্ধুদের সাথে প্যান্ডেলে কাটাবো ভেবেছি। প্রত্যেক বছর নবমীতে আমাদের পাড়ায় ঢাক বাজানো, ধুনুচি নাচ আরো কত কিছু হয়। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। বেশ আনন্দ হয় ঐদিন,পুজোর শেষ দিন বলে কথা... এরপর বিজয়া দশমীতে সবাইকে কাঁদিয়ে মা ফিরে যায় কৈলাসে। তবে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো এগুলো তো পরপর রয়েছে, তাই মন খারাপটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। এদিকে তো আবার লক্ষ্মী পূজার তিন দিন পর আমাদের দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান আছে। এই ভেবে আমি তো খুব এক্সাইটেড। এই বছর পুজোতে আমি তো জমিয়ে আনন্দ করবো। তোমরাও কিন্তু খুব মজা কোরো।

পৃথিকা চক্রবর্তী
পঞ্চম শ্রেণী, জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস

ড্যাংকুরকুর বাদ্যি বাজে

কথায় আছে না, "বাঙালির বারো মাসে, তেরো পার্বণ।" কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে কোন পুজোটা আমার ভালো লাগে জানো? অবশ্যই দুর্গাপূজা। শরৎকালের আকাশে সাদা ধবধবে পেঁজা তুলোর মত মেঘ, শিউলি ফুল আর কাশফুলের দল জানিয়ে দেয় মায়ের আগমনী বার্তা। আর তার সাথে আকাশে ভেসে আসা পুজোর গন্ধ ও ঢাকের আওয়াজ।

দুর্গাপূজায় আমরা সবাই দুগ্গা মাকে দেখতে যাই। এই চার দিনে মাকে নতুন শাড়ি, গয়না ও অস্ত্র প্রদান করা হয়। মা শুধু একাই থাকে না, সাথে থাকে তার চার ছেলে-মেয়ে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। আর থাকে এদের চার বাহন– পেঁচা, হাঁস, ময়ূর ও ইঁদুর আর তার সঙ্গে থাকে সিংহ ও মহিষাসুর ।

এই সময় সবারই অনেক নতুন জামা হয়ে থাকে। এবারে আমার সাতটা জামা ও দুটো জুতো হয়েছে। সেগুলো পরে সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। পুজোর কটা-দিন প্যান্ডেলে ঢাকের আওয়াজ শুনলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। দুর্গাপূজায় মা-বাবা আর বোনের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। শুধু ঠাকুর দেখাই নয়, ফুচকা খাওয়া, আইসক্রিম খাওয়া, বেলুন কেনা আরও কত কি! আগের বারের প্যান্ডেলগুলো খুব সুন্দর দেখতে হয়েছিল। এক একটা প্যান্ডেলে এক এক রকমের সাজ। এই চার দিন মন যেন অন্য এক আনন্দের জগতে মেতে থাকে। পড়াশোনা একেবারে বন্ধ। এই চারদিন পর পুজোর শেষে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। আবার পড়াশোনা, পরীক্ষা সব কিছুতে ফিরে আসা। কিন্তু তাও আমরা সবাই একসাথে বলি যে, "আসছে বছর আবার হবে।"

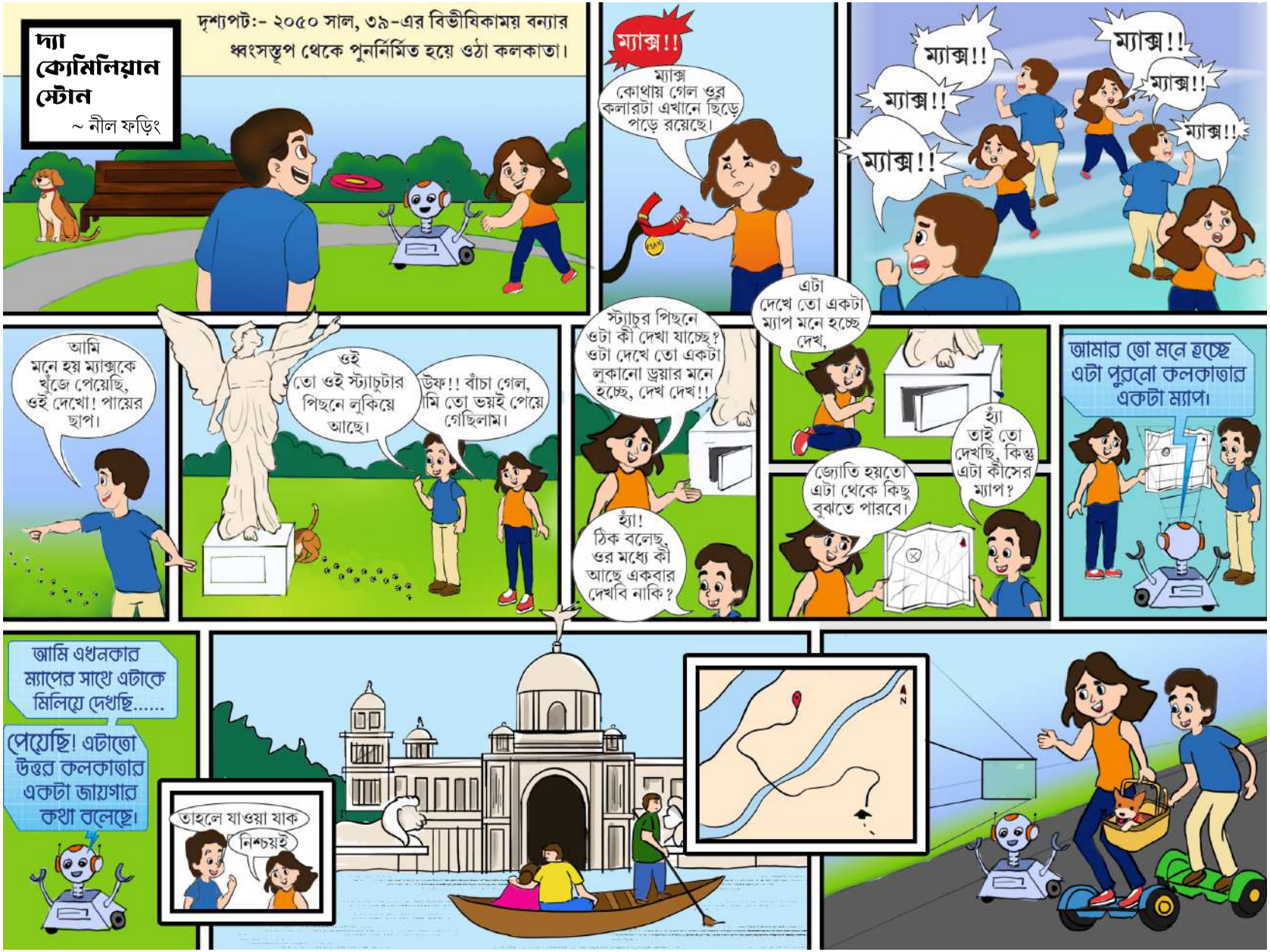
দ্যা কোমিলিয়ান স্টোন
~ নীল ফড়িং
দৃশ্যপট:- ২০৫০ সাল, ৩৯-এর বিভীষিকাময় বন্যার ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্নির্মিত হয়ে ওঠা কলকাতা।
ম্যাক্স!!
ম্যাক্স কোথায় গেল ওর কলারটা এখানে ছিড়ে পড়ে রয়েছে।
ম্যাক্স!!
ম্যাক্স!!
ম্যাক্স!!
ম্যাক্স!!
ম্যাক্স!!
আমি মনে হয় ম্যাক্সকে খুঁজে পেয়েছি, ওই দেখো! পায়ের ছাপ।
ওই তো ওই স্ট্যাচুটার পিছনে লুকিয়ে আছে।
উফ!! বাঁচা গেল, আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম।
স্ট্যাচুর পিছনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে? ওটা দেখে তো একটা লুকানো ড্রয়ার মনে হচ্ছে, দেখ দেখ!!
হ্যাঁ! ঠিক বলেছ, ওর মধ্যে কী আছে একবার দেখবি নাকি?
এটা দেখে তো একটা ম্যাপ মনে হচ্ছে দেখ,
হ্যাঁ তাই তো দেখছি, কিন্তু এটা কীসের ম্যাপ?
জ্যোতি হয়তো এটা থেকে কিছু বুঝতে পারবে।
আমার তো মনে হচ্ছে এটা পুরনো কলকাতার একটা ম্যাপ।
আমি এখনকার ম্যাপের সাথে এটাকে মিলিয়ে দেখছি.....
পেয়েছি! এটাতো উত্তর কলকাতার একটা জায়গার কথা বলেছে।
তাহলে যাওয়া যাক
নিশ্চয়ই
N

ওই চিহ্ন দেখাতে যেথায়,
পায়ে পায়ে উত্তর ০৭
পশ্চিম ৩২ চল, পদতলে
খুঁজলে পাবে জমূল্য রতন।
আমিও না
কি সুন্দর!
আমি এরকম বাড়ি আগে কখনো দেখিনি।
কিন্তু এবার আমরা কী করব?
ম্যাপের উল্টো দিকে কিছু সংকেত লেখা রয়েছে দেখ!
তুই কিছু খুঁজে পেলি?
এখানেও কিছু নেই!
না,
তুই কিছু পেলি?
এখানেও ও নেই!
সত্যি! কই দেখি?
ঠিক আছে এদিকে আয়, আমি চিহ্নটা খুঁজে পেয়েছি
প্রধান থেকে উত্তরে ৫৭ পা
এবার পশ্চিমে ৩৫ পা
এই পাথরটা মনে হয় ফাঁপা, কীরকম শব্দ হচ্ছে শোন
হ্যাঁ ঠিক বলেছিস!
আমার মনে হয় এটা ফাঁপা।
এটা সরানোর চেষ্টা করে দেখা যাক।
এখানে তো একটা সিঁড়ি রয়েছে দেখছি!
সব গুজব তাহলে সত্যি! এই পাথরটা আমার চাই যে কোন মূল্যে!...
the chameleon stone...
কি সুন্দর দেখতে এটা!
এটা কি ভারী! দুজন মিলে খুলতে হবে।
হ্যাঁ সত্যিই খুব ভারী! এইতো খুলেছে।
এর মধ্যে তো অনেক গয়না রয়েছে।
মনে হয় সোনার, কিন্তু এটা কি পাথর?
এটা যে একটা গোপন ঘর
ওহ্ দেখো একটা ট্রাক, মনে হয় ওতেই এখুনি আছে।

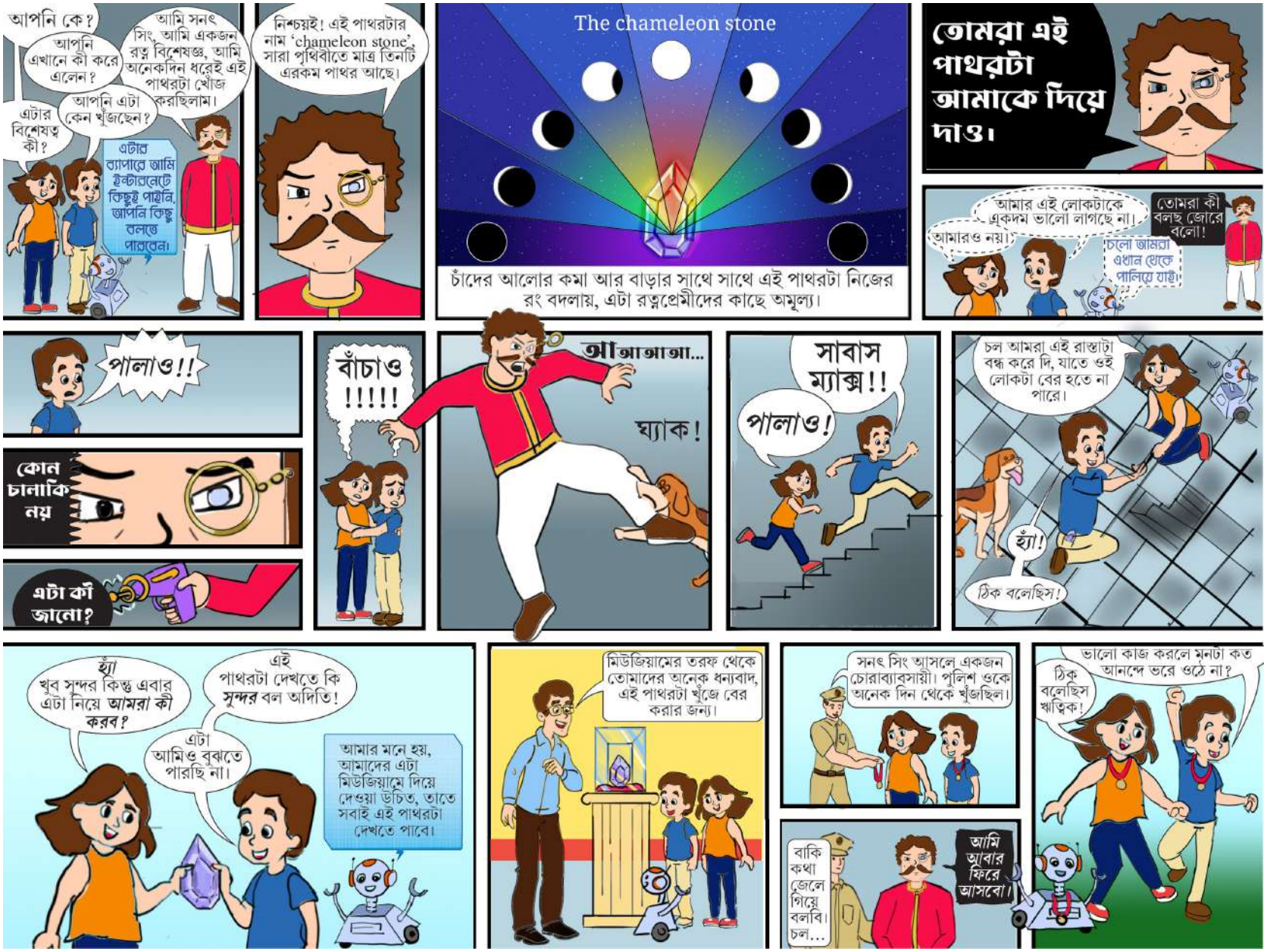
আপনি কে?
আপনি এখানে কী করে এলেন?
আমি সনৎ সিং, আমি একজন রত্ন বিশেষজ্ঞ, আমি অনেকদিন ধরেই এই পাথরটা খোঁজ করছিলাম।
আপনি এটা কেন খুঁজছেন?
এটার বিশেষত্ব কী?
এটার ব্যাপারে আমি ইন্টারনেটে কিছুই পাইনি, আপনি কিছু বলতে পারবেন।
নিশ্চয়ই! এই পাথরটার নাম 'chameleon stone', সারা পৃথিবীতে মাত্র তিনটি এরকম পাথর আছে।
The chameleon stone
চাঁদের আলোর কমা আর বাড়ার সাথে সাথে এই পাথরটা নিজের রং বদলায়, এটা রত্নপ্রেমীদের কাছে অমূল্য।
তোমরা এই পাথরটা আমাকে দিয়ে দাও।
আমার এই লোকটাকে একদম ভালো লাগছে না।
আমারও নয়।
তোমরা কী বলছ জোরে বলো!
চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।
পালাও!!
কোন চালাকি নয়
এটা কী জানো?
বাঁচাও !!!!!
আআআআ...
ঘ্যাক!
সাবাস ম্যাক্স!!
পালাও!
চল আমরা এই রাস্তাটা বন্ধ করে দি, যাতে ওই লোকটা বের হতে না পারে।
হ্যাঁ!
ঠিক বলেছিস!
হ্যাঁ খুব সুন্দর কিন্তু এবার এটা নিয়ে আমরা কী করব?
এই পাথরটা দেখতে কি সুন্দর বল অদিতি!
এটা আমিও বুঝতে পারছি না।
আমার মনে হয়, আমাদের এটা মিউজিয়ামে দিয়ে দেওয়া উচিত, তাতে সবাই এই পাথরটা দেখতে পাবে।
মিউজিয়ামের তরফ থেকে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, এই পাথরটা খুঁজে বের করার জন্য।
সনৎ সিং আসলে একজন চোরাব্যাবসায়ী। পুলিশ ওকে অনেক দিন থেকে খুঁজছিল।
বাকি কথা জেলে গিয়ে বলবি। চল...
আমি আবার ফিরে আসবো।
ভালো কাজ করলে মনটা কত আনন্দে ভরে ওঠে না?
ঠিক বলেছিস ঋত্বিক!

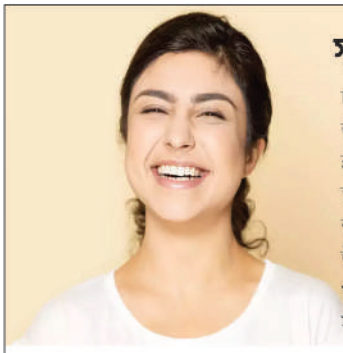

সুন্দর ত্বকের রহস্য কথা

দাগ ছোপহীন উজ্জ্বল ত্বক আমাদের সবারই পছন্দ। কিন্তু এই কর্মব্যস্ত জীবনে আলাদা করে ত্বকের জন্য অনেকেরই নেওয়া হয় না। এতে অনেক সময় রোদে পুড়ে ও ধুলো ময়লায় ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। আর তখনই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা নিয়ে আমাদের মাথায় হাজারটা চিন্তা আসে। তখনই আমরা চটজলদি কেমিক্যাল প্রোডাক্টের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ি। তাতে কিন্তু আমাদের ত্বকের আরও ক্ষতি হয়, দেখা যায় বিভিন্ন রকম সমস্যা। তাই ফর্সা করার ক্রিম বা লোশানের পরিবর্তে ঘরোয়া কিছু উপায়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঘরোয়া উপাদান ব্যবহারের সাথে সাথে শরীরচর্চা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করাটাও জরুরী।

সবার প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, যে নিয়মগুলো অনুসরণ করলে সারা বছর ত্বক উজ্জ্বল দেখাবে—

১) ফেসপ্যাক – উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ফেসপ্যাক হল একটি বিশেষভাবে তৈরি রান্নাঘরে উপলব্ধ উপাদানের মিশ্রণ যা উজ্জ্বল ত্বক পেতে সাহায্য করে। ত্বকের ধরন এবং উপাদানগুলির ওপর নির্ভর করে সপ্তাহে ১-৩ দিন হিসেবে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

প্রতিদিন স্কুল কলেজ অফিস থেকে ফিরে তুলোর মধ্যে এক-দু ফোঁটা নারকেল তেল মিশিয়ে ভালো করে ফেস ক্লিন করে নেওয়ার পর একটি বাটিতে ১ চামচ টক দই, ১/২ চামচ কস্তুরি হলদি বা রান্নায় ব্যবহৃত হলুদ বা কাঁচা হলুদ বাটা, ১ চামচ মুলতানি মাটি, এক চামচ চালের গুঁড়ো, এক চামচ বেসন, এক চামচ গোলাপ জল, এক চামচ চন্দন গুঁড়ো বা বাটা চন্দন, এক চামচ কমলালেবুর খোসার পাউডার প্রভৃতি ভালো করে মিশিয়ে থিক পেস্ট বানিয়ে সপ্তাহে ১-৩ বার ফেসপ্যাক হিসেবে কুড়ি মিনিট সময় পর্যন্ত মুখে মেখে রাখলে ত্বক পরিষ্কার হয়, সাথে উজ্জ্বলতা বাড়ে। এই মিশ্রণটিকে রোজ সকালে স্নানের আগে ও রোদ থেকে বাড়ি ফেরার পর ক্লিনজার হিসেবে ১-২ মিনিট আলতোভাবে মুখে ম্যাসাজ করলে ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার হয় এবং উজ্জ্বল দেখায়।

ট্যান রিমুভার-এর জন্য আলু, টমেটোর রস, ১ চামচ কফি পাউডারের সাথে মিশিয়ে পেস্ট লাগালে অনেকটা কালো ভাব কাটে। এছাড়া পাকা পেঁপে, লেবুর রস, অ্যালোভেরার নির্যাস প্রভৃতির ট্যান রিমুভে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সপ্তাহে ১-২ বার ফেস স্ক্রাব করা জরুরী। স্ক্রাব করার জন্য উপরিউক্ত উপাদানগুলির সাথে চালের গুঁড়ো, চিনি ব্যবহার করা হয় তবে মনে রাখতে হবে একদিন বা দুদিন বা কিছুদিন ব্যবহার করলে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে চলবে না, সারা বছর পরিচর্যা করলে তবেই ফল লাভ করা যাবে।

স্কিন কেয়ার রুটিনে সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিন দিন 'আইস ফেসিয়াল' রাখা যেতে পারে। এতে ত্বকে জেল্লা ফিরে আসবে কয়েকদিনেই। এছাড়া ব্রণ বা অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিষ্কার জলে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। তারপর ১-২টি আইস কিউব আলতো ভাবে ত্বকে ঘষে নিলে পোর্স পরিষ্কার হয়, সাথে অতিরিক্ত তেল তেলে ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, মুখে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়, পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে।

২) খাদ্যাভ্যাস : আমাদের ত্বক একটি জটিল অঙ্গ যার গঠন কার্যকারিতা এবং চেহারা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় থাকা দরকার ভিটামিন A, B, C, E সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদান যা কোলাজেন উৎপাদন ও ত্বক মেরামতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রোজকার দুপুরের খাবারের সাথে রাখা যেতে পারে স্যালাড যেমন শসা, টমেটো, গাজর, লেটুস পাতা, পেঁয়াজ, গোলমরিচ গুঁড়ো যা ত্বককে হাইড্রেড রাখতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল যেমন—ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, পাতিলেবু, মৌসাম্বি লেবু, কমলালেবু। স্বাস্থ্যকর চর্বির মধ্যে পড়ে— অ্যাভোকাডো, চিনাবাদাম, আখরোট, চিয়া সীডস, ফ্লাক্স সীড, প্রোকায়োটিক ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাদ্য— টক দই, কুমড়ো, বীজ ছোলা প্রভৃতি খাদ্য তালিকায় যোগ করা দরকার।

ডিটক্স ওয়াটার: ঘরে তৈরি ডিটক্স ওয়াটারে চুমুক দিলেই সারা বছর ত্বকের জেলা বজায় থাকবে। তার জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের আগে সুন্দর ত্বক পেতে চিন্তা করতে হবে না। শুধু ত্বক নয় চুল ভালো রাখা এবং ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ডিটক্স ওয়াটারের চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। কয়েকটি ঘরোয়া উপকরণ জলে মেশাতে পারলেই তৈরি হয়ে যাবে চমৎকার ত্বকের ওষুধ।

ক) সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস ঈষৎ উষ্ণ জলে আগে থেকে ভেজানো (Overnight soaked) ১চামচ চিয়া সীড বা ফ্লাক্স সীড, ১টি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করা যেতে পারে।

খ) ৫০ গ্রাম ফ্লাক্স সীড, ৫০ গ্রাম মেথি, ১০-১৫ গ্রাম আজোয়ান একটি বড় টুকরো দারুচিনি মিশ্রিত করে মিক্সারে পাউডার বানিয়ে রেখে দিলে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস ঈষৎ উষ্ণ জলে মিশিয়ে পান করলে ত্বকের সমস্ত সমস্যা দূর হবে।

৩) নিয়মিত শরীরচর্চা: সুন্দর ত্বক পেতে যত্ন নেওয়া ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি প্রয়োজন শরীরচর্চার। কর্মব্যস্ততার জীবনে অনেকেই শরীরচর্চা করার সময় পান না। কিন্তু তার মধ্যে থেকেই ১৫-২০ মিনিট সময় বের করে সকালে বা সন্ধ্যায় শরীরচর্চা করাই যায়। ত্বকের উজ্জ্বলতায় যোগাসন ও প্রাণায়ামের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেমন-তেমন করে যোগাসন অনুশীলন করলেই হবে না, তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে যোগাসন অনুশীলন পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

প্রথমে আসনের জন্য শরীরকে প্রস্তুত করতে কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, স্ট্রেচিং ব্যায়াম বা সবথেকে ভালো সূর্য নমস্কার করা দু থেকে চার সেট।

তারপর শুরু করতে হবে মূল আসন।

শেষে শীতলীকরণ ব্যায়াম হিসেবে ধ্যান বা শবাসন করতে হবে এক মিনিট।

যেসব যোগাসন উজ্জ্বল ত্বকের সাথে সাথে শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য হল সর্বাঙ্গাসন। এছাড়া রয়েছে কুর্মাসন, ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, উষ্ট্রাসন, হলাসন। এই প্রত্যেকটি আসন মুখের দিকে রক্ত সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করে ত্বকের গুণমানকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন ২০-৩০ সেকেন্ড তিন সেট করে এই ভঙ্গিগুলো অভ্যাস করলে ত্বক উজ্জ্বল হবে এবং নিতেজতা মুক্ত হবে।

ভূজঙ্গাসন

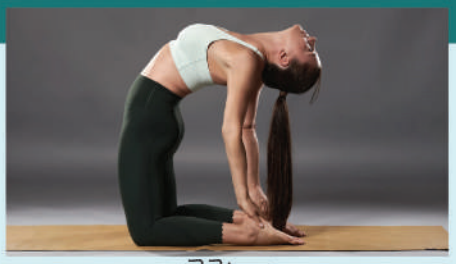

উষ্ট্রাসন

সর্বাঙ্গাসন

হলাসন

শলভাসন

অর্ধ কুর্মাসন

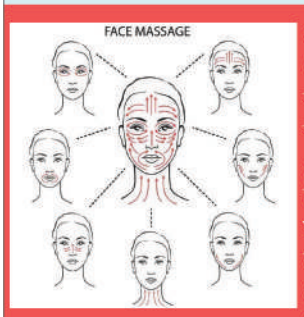

৪) ফেস যোগা ও ম্যাসাজ – ফেস যোগা ও ম্যাসাজ ত্বককে ভেতর থেকে পুনরুজ্জীবিত করে, ভেতরে সৌন্দর্য এবং বাহ্যিকে উজ্জ্বলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেস যোগায় কিছু সাধারণ ব্যায়াম আছে যার জন্য কিছু উপায়ে মুখ ম্যাসাজ বা ট্যাপ বা ভঙ্গি করতে হবে, যা মুখের পেশীগুলিকে উদ্দীপিত করে সামগ্রিক ত্বকের চেহারা উন্নত করার জন্য কার্যকর। রোজ সকালে বা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চেষ্টা করতে পারেন।

বেলুন ভঙ্গি : গভীর শ্বাস নিয়ে যতটা সম্ভব বাতাস দিয়ে মুখটি পূরণ করতে হবে ঠোঁট দুটি ডান বা বাম আঙুলে তর্জনীয় ও মধ্যমা দিয়ে চেপে রাখতে হবে ৩০ সেকেন্ড এইভাবে দু-তিনবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

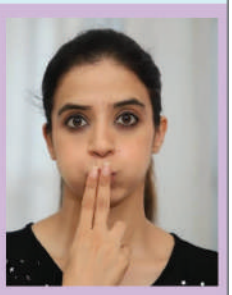

Pout And Smile: কয়েকবার গভীর শ্বাস নিয়ে ঠোঁট দুটিকে Pout করার ভঙ্গি করতে হবে. পাশাপাশি যতটা সম্ভব স্ট্রেচ করে হাসতে হবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড দু-তিনবার করতে হবে।

Face Tapping: নিয়মিত ফেস ট্যাপ ত্বকের বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। মুখে খুব দ্রুত এবং সহজে উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে দু হাতে সব কয়টি আঙুলের ডগা দিয়ে পুরো মুখে আলতো করে টোকা দিতে হবে। Oil application বা ময়েশ্চারাইজার লাগানোর সময় এই ফেস ট্যাপিং করা যায় সহজে।

লুণ্ঠিত শৈশব

তাপসী প্রামাণিক

দিন-রাত, লেখা-পড়া
পিঠে ব্যাগ বড়ো ভারী,
প্রত্যাশার পাহাড়েতেই
শিশু আজ ঠেলাগাড়ি।

সাঁতার- জিম- অংকন
নাচ-গান ও শেখা চাই,
কম্পিউটার না জানলে
এই জগতে দাম নাই।

স্কুলটা ছুটি হলে পরে
কত প্রাইভেট টিউশন,
খেলাধুলা ছেড়ে আজ
নানা রকম ফিউশন!

ইঁদুর-দৌড়েতে শিশুর
হারিয়ে গেছে শৈশব,
হিংসুটে অপরাধী নিষ্ঠুর
দুরাচারী হচ্ছে সব।

বাবা-মা আর গুরুজনে
নেই যে কোনো ভক্তি,
কৈশোরে কুপথে চলে
নেশাতেও হয় আসক্তি।

সম্পর্ক সব হারিয়ে যায়
আপনজনেরা কোথায়?
রূপকথার গল্পরা আজ
শুধু ইতিহাসের পাতায়।

পুনর্জন্ম

শ্যামলী দত্ত

এই মেয়ে, তোমার নাম কী!
তা আমি জানি না।
তিলোত্তমা নাকি অভয়া?
তোমার খুব ঘুম পেয়েছিল
এটাই ছিল তোমার অপরাধ,
আর সেই অপরাধের সুযোগ নিল
কয়েকটা পশু-রাক্ষসরূপী মানুষ।
যারা তোমাকে পাঠিয়েছিল
চির ঘুমের দেশে।
তুমি কি জানো?
তোমার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ রাত জেগেছে,
মোমবাতি হাতে রাত জেগেছে আট থেকে আশি!
তুমি কিন্তু চির ঘুমের দেশে ঘুমিয়ে পড়ো না,
ফিরে এসো, এই পোড়া দেশে
মা লক্ষ্মী নয়, মা চন্ডীরূপে।।

তোরে নাহি দিব যেতে

স্বপ্না মুখার্জী

কোন অজানায় বাঁধলি বাসা
ওরে আমার বাঁধন হারা,
তুই ছাড়া যে সবই বৃথা
সবই আমার বন্ধ-কারা।

আছিস রে তুই চাঁদের দেশে
চড়কা কাটা বুড়ির কাছে,
তোকে বেঁধে রাখব আমি
সে শক্তি কি আমার আছে?

চাঁদের আলো চুরি করে
আনবি রে তুই মুঠি ভরে,
সেই আলোটাই ছড়িয়ে দিবি
দুঃখিনী এই ধরার পরে।

সেই আলোতেই আলো পেয়ে
ফুটবে যত কুসুমকলি,
সেই আলোতেই আলো পেয়ে
জাগবে বর্ণের পাক-পাকালি।

মাঝগগনের সূর্য হয়ে
উঠবি যখন আকাশেতে,
দেখবে লোকে ভাববে তখন
এ কি আনন্দ ধরণীতে!

সন্ধ্যাবেলায় আবার যখন
পড়বি ঢলে পশ্চিমে,
ত্রিলোক মলিন হবে তখন
বলবে, "তোরে নাহি দিব যেতে"।।

তোমাকে কিছু বলবো বলে

কেতকী বসু

সেদিন চোখে ঘুম ছিল না, বাতাস আধ-শোয়া
মনের থেকে মিল খুঁজেছি তোমায় কাছে পাওয়া
জীবন থেকে একটা কথা বলবো তোমায় আমি
সেদিন যেমন ছিলে কাছে আজও তেমন দামী
পাহাড় ঘেরা ঝর্ণা জলে ফুলের গন্ধ নিতে
ভালোবাসায় ভরিয়ে তুমি হাত বাড়িয়ে দিতে
অজস্র সব কথার মালা গভীর প্রকাশ রাতে
হারিয়ে যেতাম স্বপ্ন দেখে দুজন একসাথে।

সেদিন চোখে ঘুম ছিলনা পাইনি সীমানা
জানলা খুলে দমকা হাওয়া হারাই ঠিকানা
অন্য কথা অন্য কিছু ভাবের সাগর ভাসা
সহজ করে বললে তবে কাছেই শুধু আসা
প্রাণের ছোঁয়া মিথ্যে খেলা অনুভবে আড়ি
বুকের ভিতর গরম বাতাস যান্ত্রিকতায় বাড়ি।

আগল খুলে বাঁধন ভুলে উড়িয়ে দিয়ে বাতাস
একটু পরে উজান গাঙের মেঘের পরে আকাশ
প্রথম পাতা খোলা হাওয়া সৃষ্টি সুখের চাদর
তারই ওপর ভালোবাসা যত্ন আর আদর।।

আমি তোমার প্রেমিকা লিখছি

কৌশিকী ব্যানার্জী

প্রিয় ইমরান,
আমি, তোমার প্রেমিকা লিখছি…
সারা দেশে ভীষণ রকম যুদ্ধ বেঁধেছে,
কর্তা ব্যক্তিরা কীসব অন্যায় নিয়ম কানুন
চাপিয়ে দিচ্ছিল আমাদের ওপর,
ওদের ইচ্ছে ছিল, তোমায় আমায়–
আমাদের পিষে মারবে!
কিন্তু তোমরা তা চাও নি,
তাই, সবান্ধবে রাস্তায় নেমেছিলে তুমি…
তোমার মতো মূর্খ শ্রমিকও যে এসব বোঝে,
এ নাকি ওরা ভাবতেই পারেনি!
তাই ওদের ভীষণ রাগ।
আর সে কথা আঁচ করতে পেরেই,
তুমি আমায় শহর ছাড়তে বলো।
আমার সবটুকু ইচ্ছে, ভালোবাসা'র
বিরুদ্ধে গিয়ে আমি তোমার কথা রেখেছি;
আজ আমরা ব্যাসের দুই প্রান্তে
বাস করি কয়েক সপ্তা!
ওরা তোমার কথা জানার সমস্ত রাস্তা
বন্ধ করে দিয়েছে,
তাও,
আমার ঈশ্বর আমায় জানিয়েছেন,
তুমি এখনও জীবিত আছো।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ছে কারা…
ওমা, ওরা তোমার তলবে এখানেও চলে এসেছে!
আমায় তোমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করে
তছনছ করে দিচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের সবটুকু,
আমি ওদের বার বার বলছি,
"হুজুর, আমি জানি না, ইমরান কোথায়!
আপনি আমাদের মাই-বাপ আছেন,
এমনটা করবেন না!"
কিন্তু কে শোনে কার কথা!
সারাটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে,
ওরা আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো…
দাঁত, নখ দিয়ে খুঁড়তে থাকলো রক্ত-মাংসের জমি…
আমি চিৎকার করতে লাগলাম,
"বিশ্বাস করুন, ওখানে কেউ নেই,
কেউ নেই ওখানে, ওখানে যাবেন না,
ওখানে কেউ নেই! ওখানে কেউ নেই!"
রুখে দাঁড়াতে চাইলাম সর্বশক্তি দিয়ে,
কিন্তু হায়!

ঘন্টা খানেক পরে, ওরা চলে গেল!

আচ্ছা, ওরা কী করে জানলো ইমরান,
আমার বুকের মধ্যেই তোমার ওই সুপ্ত বাসাখানা?

শারদীয়া

হৈমন্তী ভট্টাচার্য

আবার এসেছে শরৎ,
শিউলির গন্ধে কাশের সমারোহে,
আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘের ভেলা।
ক্ষনিকের তরে শত ব্যস্ততার মাঝেও,
মনে দিয়ে যায় দোলা।
চারিদিকে কেমন যেন 'পুজো-পুজো' গন্ধ।
মা আসছেন সেই অপেক্ষায়, ঘোচে মনের সকল দ্বন্দ্ব।
সারা বছর হরেক রকম কাজে কাটে সময়,
কখনো চিন্তা কভু আনন্দ কভু আশা বা ভয়।
কিন্তু যখন ভাদ্র শেষে আশ্বিন এসে পড়ে,
একটা কথাই ভেসে ওঠে মনে, মা আসছেন ঘরে।
জানিস মাগো! তোর পুজো ঘিরে কত আনন্দ জাগে;
নব পরিধান, নতুন সম্পর্ক ঘটে এক মহা মিলন, রাগে অনুরাগে।
কিন্তু,
সবাই তো মা পায়না এমন নতুন কিছুর স্পর্শ।
সবার মনে জাগে না রে, নতুন করে হর্ষ।
কোন দুর্গা বাসন মাজে, কে বা কাপড় কাচে?
কেউ বা দু-মুঠো অন্ন কুড়িয়ে কোনোভাবে বাঁচে।
কেউবা আবার হাসপাতালে ডাক্তার বা আয়া
কেউবা আবার মাঠের কাজে সঙ্গী কেবল ছায়া।
সকল দুর্গার মুখে মাগো ফুটবে হাসি যবে।
মাগো তোর পুজো সেদিন সত্যিই সফল হবে।

পথভ্রষ্ট

প্রী ত ম

সেদিন আমার মাথার অদ্ভুত ভাবনারা উড়তে চেয়েছিল,
তারা মনে করেছিল হয়তো এখানেই শেষ;
স্তব্ধ হয়ে যাবে অনেক কিছু
এক বর্ষায় অকাল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাযাবরের ব্রেক ফেল করা গাড়ি
ঘুরিয়ে নিলো, টেরা কাকুর ফুচকার দোকানের দিকে
ছেলেটি মুচকি হেসে বললো,
তুই এই লঙ্কার মতোই ঝাল!
ঠিক এই ঝালের মতো স্বাদগ্রন্থি ভরিয়ে রাখিস
আমার এই ইন্দ্রিয়েরা অকেজো হয়ে পড়বে না;
আমি প্রতিক্ষনে চোখ ভেজাতে চাই,
তোকে স্পর্শ করার অপেক্ষাতে।

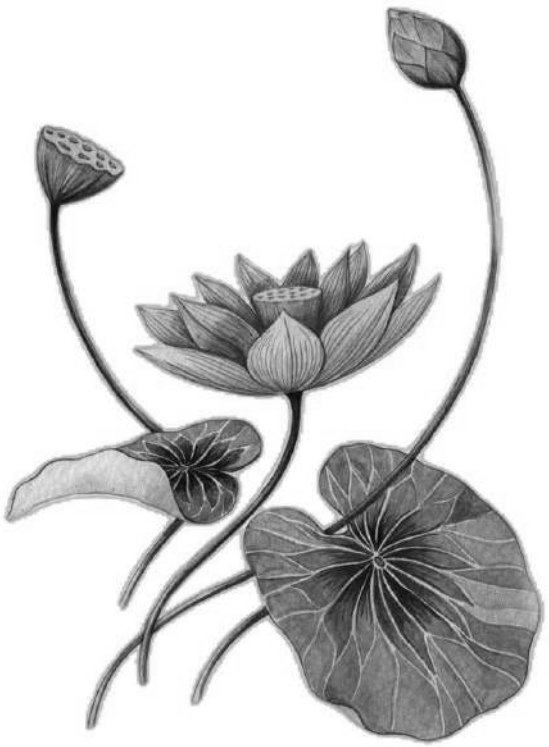

শরৎ রানী

ডাঃ সমীর সিনহা

গগনতলে আজ কি সুর বাজিছে!
পেঁজা শুভ্র তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা,
শরৎ-রবি-কিরণে নাচিতেছে তারা
কত্থক নৃত্যের মতো।

মালকোষ রাগের নব ঝংকারে আন্দোলিত মলয়ানীল;
হঠাৎ তাদের আবরিত করে কালো রূপের আস্তরণ,
রিমঝিম বৃষ্টি আর রোদের মিলনমেলা
রামধনুর স্বচ্ছ প্রকাশ—
প্রকৃতির মাতাল হওয়ার রূপ
বাতাস তরঙ্গ ভাসিছে নিজ খেলায় তরঙ্গায়িত হয়ে'
রিন-রিন রবে—
রোমাঞ্চ প্রকাশের তরে।

পুষ্প-তরুবর কুসুম সাজায়ে
দাঁড়ায়ে রয়েছে পথে,
কোন অভিলাষ হইবে পূরণ
প্রকৃতির নবসাজে।

শিউলি, চামেলির কুসুম সুবাস
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে আসে,
কাশের বনে মাথা দোলাইয়া
কাশফুল শুধু হাসে,
অশুভশক্তি নাশিতে জননী
শুমঙ্গলারূপে,
প্রকাশিত হন দিকে দিকে তাই
আনন্দে দিন কাটে ।

দূর থেকে তাই কানে ভেসে আসে
রাগ-রাগিনীর 'রাগ' —
তার রাতুল চরণ ধৌত করে
সুরধ্বনির তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ।
শেফালিকার মালা মাথে,
শিউলি ছড়ায় পদপ্রান্তে,

প্রকাশিত তার বার্তা আনে
ত্রিভুবনের দ্বারে।

কমলালয়ে ভাঙে যে ঘুম সরোজ মহারাজে।
রাজহংসী কলনিনাদ কানে ভেসে আসে
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে
নীলোৎপলদামে-
আমন্ত্রণ এসেছে চলে
আনন্দ-যজ্ঞ ধামে।।

যন্ত্রনা

প্রীতম মুখার্জী

যন্ত্রণা,
পিঁয়াজের একাধিক মলাটের মত
প্রতিবার
প্রতিশ্রুতি তোমাকে ছোঁয়ার।
প্যারাসাইট আদুরে জীবন
কক্ষপথহীন।

সে নেই,
তাই বহুরূপী বেলুনটা আকাশে
রং বদলায় বারবার,
অজান্তে, নিঃশব্দে।

রাত ঘনায়, অন্ধকার।
অপরাধীর জন্ম হয়,
হৃদয়ের যে কোণে ছত্রাক।

খড়কুটো ভেদ করে উঠে আসে
যে অধীনতা, তা আমারই অঙ্গ।

নারী, তোমায় রক্ষা করতে নারি!

তৃষিতা সরকার

যে নারীকে পূজিত করো দেবীর আসনে,
সেই নারীকেই ব্যবহার করো কামনা মোচনে?

যে নারীর সাথে তোমার রয়েছে নাড়ির টান,
সেই নারীর বসন নিয়ে আজ করছো টানাটান?

দুই হাতে আগলে রাখে যেসব মাতৃসমা নারী,
সেই নারীর সম্মান আজ বিপন্ন যে ভারী।

গগনচুম্বী লোভ-লালসার শিকার আজ সমাজ,
সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাব বড়োই আজ।

তিন কি তেইশ! আট কি আশি! রেহাই যে নেই কারো
এত পাশবিকতার পরেও নিজেকে আরশিতে দেখতে পারো?

নৃশংসতা আর বর্বরতা আজ আসীন এমন স্থানে
পশুরাও মানবে হার এহেন 'পাশবিক' আচরণে।

মানুষ নাকি উন্নত খুবই, সবার চাইতে সেরা
চাইনা এমন উন্নতি, আদিম যুগে যাক ফেরা।

শহর-নগর সরব আজ সুবিচারের আশায়,
মানুষরূপী নরপিশাচদের শাস্তির অপেক্ষায়।

দ্রৌপদীর মান রক্ষায় দ্যুতসভাতে ছিলেন যে তার সখা,
কিন্তু কলি যুগের 'অভয়া'রা যে ভীষণ ভাবে একা।

কাটবে না কি এই দুর্দিন? ঘুচবে না কি আঁধার?
উঠবে না কি নতুন সূর্য সুবিচার আর প্রত্যাশার?

যুগে যুগে দেবীরূপে করেছ দুষ্টের দমন,
দুর্গতিনাশে মাগো তোমায় আবারও করি বরণ।।

সেই মেয়েটি

অমিত

একটা মেয়ে অনেক দূরে থাকে
জানালা দিয়ে পাহাড়টাকে ডাকে
বাইরে তখন ঝকমকে রোদ্দুর।

সমুদ্রের সেই ঝিনুকটার মত
মেয়ের বুকে আকাশ জোড়া নীল
মনের ভেতর উড়ন্ত গাংচিল।

সে রাত ছিল স্বপ্ন দেখার ক্ষণ
তার দুচোখে সবুজ ঝাউবন
আর মাত্র কয়েক মাস পর...

নতুন জীবন নতুন সংসার
ভোররাতে সেই ঘুমন্ত মেয়েটার
দুমড়ে মুচড়ে দেহটি ছারখার।

মেয়েটি তখন বালির স্তূপের ভেতর
জল ভেঙ্গেছে শিরায় শিরায় তার;

ঠোঁটের কোণে শুকনো রক্তের দাগ
মায়ের বুকটি জ্বলে পুড়ে খাক
ঘুমিয়ে আছে নয়নের মণি কন্যে–

শহর কাঁদবে আজ রাতে তার জন্যে।

আবদার

লিপি

আমার লেখা জীবনের গল্পে
তুই একটা নতুন অতিথি,
তোর অতিরিক্ত সময়টুকু বাঁচিয়ে যদি তুই আমার নামে লিখে দিস,
কখনোই অভিযোগের পাহাড় তৈরী হবে না আমাদের;
যদি কখনো
কোনো একদিন তোর অতিরিক্ত সময়টাও ফুরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের রূপ নেয়,
সেদিনও আমার একটাই আবদার,
ভালো থাকিস। নিজের জন্য বাঁচিস।
প্রশ্ন করবি সেদিন -
আমাদের স্মৃতি?
আমার উত্তর: তুই পুরোটাই আমার জীবনের গুছিয়ে রাখা বিশেষ স্মৃতিদের অন্যতম।

উদ্দেশ্যহীন গন্তব্য

রী ত ম

অন্তহীন যাত্রা, একাকী বিচরণ,
মনের গোলকধাঁধা এক অনন্য গানের প্রতিধ্বনি।
কোনো গন্তব্য চোখে পরে না, তবুও পথ উন্মোচিত হয়
নির্জনে স্বাধীনতা, হৃদয় অবাধ থাকে।
নিঃসঙ্গতার মধ্যে, আমি আমার কণ্ঠ খুঁজে পাই,
যেখানে শব্দগুলি নদীর মতো প্রবাহিত হয়,
আমার হৃদয় আনন্দিত হয়।
মুহূর্তের নিস্তব্ধতায়, কবিতা জীবন্ত হয়,
নির্জনতা বৃদ্ধি পেয়ে শূন্যতায় প্রকাশ পায়;
একাকী বিচরণে মন মুক্ত।

আপনি কে

অম্লান

পৃথিবীর অবশিষ্ট আছে যা সম্ভ্রম,
তার দাবি জানানোর আপনি কে?

কচি পাতা - সুরভী পরাগ - রঙিন পাপড়ি;
শরতের বিচ্ছিন্ন মেঘ - সবই ছদ্মবেশ!
সূর্যাস্তের লালিমা মেখেছে অকৃতজ্ঞ,
ফুটেজ খেতে কত না যজ্ঞ,
বনস্পতি হোক না অজ্ঞ - লড়াই করে দেশ।

টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে খেলি দাবা,
মন্ত্রী-খানা নালায়-জলায় মরেছে;
যুবরাজের শুধু ঘুম চুরিতেই ক্লান্তি।
পাহাড়ে পালায় শত যৌবনের প্রাণ -
হাহাকার যেন সহস্র খনির শ্মশান,
শহরতলির কংক্রিট ঘিরে শান্তি!

আজ যেখানে সমতল হয়ে গেছে,
পাহাড়প্রমাণ বোঝা ছিল মনুষত্বের;
ঋণ করেছিল চোরা-নেতৃত্বের জয়গান।
সূর্যমুখী দিব্যি করে আঁকড়ে ছিল যে প্রেম;
ভাসান গেছে ফিবোনাকির অন্তমিলে,
প্রতিটা জগত ধর্ষকে করেছে স্নান।

পৃথিবীর অবশিষ্ট আছে যা সম্ভ্রম,
তার দাবি জানানোর আপনি কে?

সেই মেয়েটা

সুকান্ত মন্ডল

সেই মেয়েটা! কালো, লম্বা, রোগা গালের বাঁ দিকটায় একটা কাটা দাগ।
দারিদ্রতা, অপুষ্টি আর বিপন্নতার জীবন্ত পোট্রেট;
তবু চোখ দুটোতে অদ্ভুত এক মায়া—
যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।

সেই মেয়েটা, ক্লাস VIII-B, রোল ৫৫।
যার দিন শুরু হয় অনেক ভোরে তিন বাড়ির বাসন
মেজে। তারপর ভাইকে রেডি করিয়ে একসাথে স্কুলে আসা।
হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন মিড-ডে-মিলের আশায়।

সেই মেয়েটা,
যার মা ওদের রেখে হারিয়ে গেছে জীবন নদীর বাঁকে–
হয়তো বা সুখ-পাখির খোঁজে।
বাবা মহামায়াতলার একটা কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি গার্ড। স্কুল থেকে বেশ কিছুটা দূরে পুরনো ইট-ভাটার বাঁ-দিকের গলির ভিতর ওদের দর্মা-ঘেরা জীর্ণ বাড়ি, ওর সাথে বেশ মানানসই।
এক বুক হতাশা আর অবহেলায় জর্জরিত হয়ে একটা-একটা করে খসে পড়ছে তার হাড়-পাঁজর।

সেই মেয়েটা,
রোজ স্কুলের শেষ সারিতে। প্রায় রোজ বকুনি —
কখনও কখনও শাস্তি। তারপর স্কুল ছুটির পরে ভাইকে রেখে সোজা কাজ-বাড়িতে। এরপর সন্ধ্যের হাত ধরে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফেরা। এসেই বাড়ির সমস্ত কাজ–
ঘর মোছা, বাসন মাজা, জল আনা এমনকি রাতের রান্নাও।
তার বদলে অনেক রাত্রে কপালে জোটে মাতাল বাবার মার।
নাকে, মুখে, রক্তে মাখামাখি।

সেই মেয়েটা, তবু স্বপ্ন দেখে।
মনজ্বলা মাঝরাতে জেগে থাকে তার শুকনো চোখ।
জীবনের স্বপ্ন, আলোর স্বপ্ন তাকে আচ্ছন্ন করে গভীর রাতে।
হেড স্যারের কথাটা বড্ড মনে পড়ে ওর —
"যেখানে থাকবি আলোয় ভরে দিবি চারপাশ।"

সেই মেয়েটা, চৈতি সেন, ক্লাস VIII-B, রোল ৫৫।
আলোর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরে সারাক্ষণ।
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ও লক্ষ্যে অবিচল –
ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের পাতায় এলিয়ে দেয় ওর ক্লান্ত শরীর আর মনের সবটুকু গোপন ইচ্ছা।
ঠোঁটের কোণের জমাট রক্ত ধুয়ে ফেলে আজও ওর হাড় জিরজিরে বুকের গভীরে খেলা করে সোনালী আলোর ঢেউ।
চোখের তারায় আলপনা আঁকে স্বপ্ন-জোনাকি।
আজও… আজও —
সেই মেয়েটা… সেই মেয়েটা…

অনন্ত কালের পথিক

বিন্দিয়া গোস্বামী

তারপর...
তারপর তুমি সামনে রাস্তা ধরে
একা এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও সম্মুখে কোন পথিক
পাও না পাও।

কত বসন্ত ঝরে যে যায় রক্ত পলাশে।
ঝরা পাতার কান্না শুনায় মুক্ত বাতাসে।

পথিক তুমি এগিয়ে যাও
এগিয়ে যাও,
অনন্ত কালের পথিক তুমি এগিয়ে যাও।

থেমে যাওয়া জীবন নয়
মৃত্যুসম হয়,
বাধা পিষ্ট করে যে হয় বিশ্ব ভুবন জয়।

পথে যে দেখেছো হাড়গোড় তা
মানুষের নাকি মানবতার?
জানি,
বাকি গুলো সব বিবেক পোড়ানো
ছাই ভস্মের অঙ্গার।

সূর্য্যের দেখেছো প্রখরতা সব
চৌচিরতার মাঠে,
তৃষ্ণার্ত প্রাণ এখনো ছুটে চলে
ওই কলসী কাঁকের ঘাটে।

একা থেকে একা জীবন কাঁদে
পথের বাঁকে বাঁকে,
স্মৃতিগুলো সব কুঁড়ে কুঁড়ে হায়
ঝুলিতে তুলে রাখে।

কঠিন রৌদ্র তপ্ত দুপুর তবুও
তুমি এগিয়ে যাও
বিরামহীন পথিক তুমি এগিয়ে যাও,
পথে কোন পথিক পাও না পাও।

জেনে রাখো এখানে হাঁটছো তুমি
মানবতার পথে,
নিজ পায়ে হেঁটে, নয় কোন সারথির রথে—

তাই বলি পথিক তুমি এগিয়ে যাও
এগিয়ে যাও
সম্মুখে বাধা বিপদ পিষ্ট করে
তুমি এগিয়ে যাও।
মানবতার ফসল ফলাও,
বীজের কানে কানে
জাগ্রত হতে বলে যাও।

জীবনের ছায়াপথ অলিগলি মোড়ে,
কত কঙ্কাল, কবর পাড়ে
দেখেছো কত জীবন মরণের দ্বন্দ্ব দেখেছো রক্ত নেশায় অস্ত্র চালিয়ে
সুখের কপাট বন্ধ।

তুমি তো দেখেছো রাজপথে নামা
পথ শিশুটা ভাত চায়!
কখনো কুকুরের সাথে ভাগাভাগি করে
উচ্ছিষ্টগুলো খায়।

তুমি তো রাস্তার বাঁ দিক মোড়ে হেঁটে যাও
পথিক
তাই ডান দিক তুমি দেখোনা।
কানের আড়ালে অনেকে কেঁদে যায়
যেন শুনেও তুমি শুনোনা।

স্পষ্ট দেখেছো দাবানল দাহে
অরণ্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়,
তবুও বৃষ্টি পড়েনা শুধু মেঘে মেঘ ঘষে,
আর আকাশেতে বিদ্যুৎ চামকায়!

কখনো মানুষের মাঝে মানুষ খুঁজো
অন্ধ বিষাদ কালে,
আর নাচো উন্মাদ হয়ে মাদলের তালে
দামামা বাজিয়ে তালে।

তুমিতো দেখেছো শ্রাবণী কষ্টে
মায়ের দু'চোখ ভিজে যায়!
হৃদয়ের দ্বারে সুখের বাগান তবু
দুঃখরা দুঃখিত থেকে যায়।

অনন্ত কালের পথিক
তুমি মহা মানবতার,
জানো কত মনুষ্যত্বের কঙ্কাল
আজ জানোয়ারের অবতার?

কত শত বলো তুমি তবু মানবতা জাগে না,
পৃথিবীটা গিলে খেলেও মানবতা মাগে না।

রক্তের দাগ লেগে থাকে পথে
অনন্ত কাল হতে,
বেদনার ক্ষতে।
কিছু কথা থেকে যায় খাতার পাতাতে।

তুমিতো দেখেছো দিনের শেষে
সূর্যটা সাগরে ডুবে যায়,
সূর্যের আলোয় চাঁদটা যে হাসে
কেউ কেউ তা ভুলে যায়।

তুমি তো দেখেছো কত শত প্রাণ
বেঁচে থাকে কত কষ্টে,
মানুষগুলো মানুষই থাক
ক্ষয় না হয় যেন নষ্টে।

লাথি মারো ওই হিংসা যজ্ঞে
যেখানে মানুষ হয়েছে মগ্ন,
ক্ষুধাতুর পেটে ভাত দাও
হয়তো এটাই সুলগ্ন।

ক্লান্ত বিকেলে আকাঙ্ক্ষার বেলাভূমি
আকাশের বুকে নিভে যায়,
চারিদিকে শুনসান আর অন্ধকার আসুক
তবুও অনন্তকালের পথিক হেঁটে যায়।

বৈতরণী পার

প্রীতিকণা দাস

করোনা কালে প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ, স্বজনহারা হয়েছিল বহু পরিবার। অনেকের করুণ পরিণতি দেখে সমাজের বহু মানুষের চোখে জল এসেছিল। হয়তো নিজের দায়িত্ব পালনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন যমরাজ স্বয়ং। আবার বহু মানুষের দুঃখের কাহিনী চির অজানাই রয়ে গেছে। তেমনি একটা গল্প বিভা দেবীর জীবনের।

বিভাদেবী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেই জন্মেছিলেন। তবে ছোট থেকেই তিনি খুব মেধাবী ছিলেন, তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে শিক্ষিকা হওয়ার। তবে অভাবের কাছে স্বপ্ন বারবার হেরে যায়, তাই তার বাবা মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাকে মিলিটারিতে কর্মরত এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে কন্যা-দায় মুক্ত হন।

বিয়ের পর সংসার নিয়ে বিভাদেবী ব্যস্ত থাকলেও তার স্বামী তার স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নেন। তিনি বাড়ি থেকে বিভাদেবীর কলেজের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। পড়াশোনা আর সংসার নিয়ে তার জীবন বেশ ভালোই কাটছিল; এর মাঝে তাদের পরিবারে আসে নতুন সদস্য, তাদের ছেলে অনির্বাণ। এভাবেই বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল, ছেলের বয়স যখন তিন বছর, তখন বিভাদেবীর কলেজের পড়াশোনা শেষ হয়। তবে তার স্বামী তাকে আরও উচ্চশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি শিক্ষিকা হতে পারেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের আগেই ঘটে গেল অঘটন, একদিন খবর এলো সীমান্তে জঙ্গি হানায় সুকোমল বাবু শহীদ হয়েছেন। ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে বিভাদেবীর পথে বসার অবস্থা, সুকোমল বাবুরও তিন কুলে কেউ নেই আর বিভাদেবীর বাপের বাড়ির অবস্থাও তেমন নয় যে আরও দুটো পেট চালাতে পারে। অগত্যা নিজের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন তিনি। কখনও ঠিকে কাজ করতেন, কখনও আয়ার কাজ করতেন, কখনও বা ছোট বাচ্চাদের পড়াতেন।

এভাবে বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছিলেন। দেখতে দেখতে চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে বিভাদেবীকে আর পরিশ্রম করতে হয় না। তার ছেলে এখন মস্ত পোস্টের অফিসার। অনেক টাকা রোজগার করে। বড় বাড়ি, দামী গাড়ি, দামী আসবাব সবই আছে। ভালো বৌমা এনেছেন বাড়িতে তার খুব সেবা যত্নও করে। তাতে আবার উপরি পাওনা, দুটো মিষ্টি নাতি-নাতনি।

এত বছরের পরিশ্রান্ত জীবনের পর এখন বিভাদেবীর সুখের জীবন, তবে এত কিছু পাওয়ার মধ্যে তার স্বপ্নটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে, তাতে অবশ্য তার খুব একটা আফসোস নেই। বাড়ির বাকিদের মুখে হাসি দেখেই তার মন খুশি থাকতো। এভাবে সবটা বেশ ভালোই চলছিল তার মাঝে ব্যাঘাত ঘটালো করোনা মহামারী।

বিভাদেবী রোজ খবরে দেখতেন কত লোক মারা যাচ্ছেন, চারিদিকে অভাব, অনটন, হাহাকার। ছেলে-বৌমার মুখেও কেমন যেন চিন্তার ভাঁজ দেখতেন। একদিন রাতে বিভাদেবী জল নিতে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ছেলের ঘরের সামনে থমকে গেলেন। শুনলেন, ভিতরে ছেলে-বৌমা কিছু একটা নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে।

অনির্বাণ: চারিদিকে যা অবস্থা মাকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে।

পিউ: কেন মাকে নিয়ে আবার কীসের চিন্তা? উনি তো ভালোই আছেন আর উনি তো সারাদিন বাচ্চাদের নিয়ে ঘরেই থাকেন।

অনির্বাণ: ওখানেই তো ভয়, এখন তো বৃদ্ধরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। মায়ের যদি কোন ভাবে সংক্রমণ হয়, বাচ্চাগুলো সারাদিন মায়ের কাছেই থাকে ওদের তো কিছু একটা হতে পারে। মায়েরও তো শরীরটা এখন খুব একটা ভালো যাচ্ছে না তাই আমি কোন রিস্ক নিতে চাইছি না।

পিউ: তাহলে তুমি কী বলতে চাইছো মাকে ঘরে আটকে রাখবো? বাচ্চাদের ওনার কাছে যেতে দেবো না? তাহলে তো মায়ের খারাপ লাগবে আর উনি বা একা ঘরে বসে সারাদিন কী করবেন?

অনির্বাণ: সেই ব্যবস্থাই তো করতে চাইছি ভাবছি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবো।

পিউ: কী বলছ! মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে? মা কী ভাববেন বলোতো! ওনার বাড়ি ছেড়ে উনি যাবেনই বা কেন?

অনির্বাণ: আমি কি মাকে একেবারে রেখে আসার কথা বলছি? কয়েক মাসের জন্য মা ওখানে থাকুক তারপর সংক্রমণ কমলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

পিউ: আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগছে না, মা'র খারাপ লাগতে পারে।

অনির্বান: আমরা তো কোন খারাপ উদ্দেশ্যে করছি না। মায়ের ওখানে ভালো লাগবে, ওরা মায়ের দেখাশোনা করবে আর মায়ের বয়সী আরও মানুষের সাথে থাকলে মায়েরও ভালো লাগবে, আমরা তো যা করছি মা আর বাচ্চাদের ভালোর জন্য।

পিউ: আমি কিছু জানি না, তোমাদের মা-ছেলের ব্যাপার তোমরা বোঝো। আমি কিছু বলতে পারবনা।

অনির্বাণ: আমি জানি মাকে বুঝিয়ে বললে মা ঠিক বুঝবেন।

এতটা শুনে বিভাদেবী চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে এলেন। তার আর ঘুম এলো না। তিনি সারারাত ভাবলেন খোকা তো ঠিকই বলেছে তিনি যেমন একদিন তার ছেলের ভালোর জন্য অনেক কঠিন কাজ করেছিলেন, তার ছেলেও আজ নিজের সন্তানদের ভালোর জন্য তার মাকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি নিজের মনেই ঠিক করলেন ছেলে কিছু বলার আগে তিনি নিজেই তাকে বলবেন, তাতে যদি ব্যাপারটা একটু সহজ করা যায়।

পরদিন সকালে বিভাদেবী সবাইকে বসার ঘরে ডেকে বললেন, দেখ খোকা পরিস্থিতি এখন খুব একটা ভালো নয়। এখন তো ষাট উর্ধ্ব মানুষদেরই সংক্রমণ বেশি হচ্ছে। তাই আমি চাইনা, আমার থেকে বাচ্চাদের কিছু হোক। আমার শরীর এখন ঠিক থাকে না প্রায়ই নার্সিংহোমে যেতে হয়। বাচ্চাদের তো আর আটকাতে পারবনা তাই আমি ঠিক করেছি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

পিউ: মা আপনি একি বলছেন? বাড়ি ছেড়ে আপনি কেন যাবেন, কোথায় বা যাবেন?

বিভাদেবী: শান্ত হও বৌমা, আমি কয়েক দিনের জন্য বৃদ্ধাশ্রম যেতে চাই। আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে আসবো।

পিউ: কিন্তু মা....

বিভাদেবী: কোন কিন্তু না। সারাদিন বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগেনা, একটু নিজের বয়সী লোকেদের সাথে থাকলে আমারও ভালো লাগবে আর হাওয়া বদল হবে। খোকা, তুই আজই কোন বৃদ্ধাশ্রমের সাথে কথা বল। এতদিন তো তোমাদের সংসার দেখলাম, এবার নিজেরা বুঝে নাও আর আমায় ছুটি দাও।

অনির্বাণ: আচ্ছা, মা আমি কথা বলে তোমায় জানাবো।

এক সপ্তাহের মধ্যে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেল, দিনটা ছিল রবিবার। সকালে বেরোনোর সময় মিঠি-মিঠাই তো কিছুতেই ঠাম্মিকে ছাড়বে না কেঁদে কেটে একাকার করে দিচ্ছে। বিভাদেবী দুজনকে কোলে বসিয়ে বললেন, "বোকাদের মত কেউ কাঁদে। আমি তো ঘুরতে যাচ্ছি। তোমরা যেমন স্কুলট্রিপে যাও আমিও যাচ্ছি কয়েকদিন বাদে ফিরে আসবো।"

বৌমাকে বললেন, "সবার খেয়াল রাখবে আর সবাই ভালো থাকবে।"

বাড়ি থেকে বেরোনোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে গেল। অনির্বাণ বিভাদেবীকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের গেটে এসে দাঁড়ালো, বড় হরফে লেখা 'বৈতরণী' বেশ অদ্ভুত নাম। ঘটনাটাও কেউ কখনো শুনেছে বলে মনে হয় না। ছেলে হাত ধরে মাকে 'বৈতরণী' পার করাচ্ছে, এসব ভেবে নিজের মনেই হাসলেন বিভাদেবী। ফেরার পথে ছেলে বলেছিল, প্রতি মাসে দেখা করতে আসবে কিন্তু বিভাদেবী পরের মাসে শুনলেন যে লকডাউন হয়ে গেছে, তাই আর ছেলে আসতে পারবেনা।

এভাবেই বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। ওখানে কোন জিনিসের অভাব ছিলনা, গল্প করার সঙ্গীও অনেক ছিল, তবে বাড়ির লোকেদের কথা তার খুব মনে পড়তো। অনেকে বলতো তাদের বাড়ির লোকেরা তাদের বাড়তি মনে করে এখানে রেখে গেছে, কিন্তু বিভাদেবী তা কখনোই মনে করতেন না। তিনি সব সময় তার ছেলে বৌমার প্রশংসা করতেন, আর বলতেন ওরা আমায় ভুলতেই পারে না।

এভাবে একটা বছর কেটে গেল, লকডাউন উঠে গেল করোনা সংক্রমণও বেশ কিছুটা কমলো। অনির্বাণকে এতদিন পর দেখে বিভাদেবী চোখের জল সামলাতে পারলেন না, ছেলের সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। ভিডিও কলে বৌমা ও নাতি-নাতনীদের সাথে গল্প করলেন। ছেলে যাওয়ার পথে বলে গেল, মা পরের

মাসেই তোমায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

আজ বিভাদেবী খুব খুশি এত দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি আবার তার নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন, তার নিজের লোকেদের কাছে আর মাত্র একটা মাসের অপেক্ষা। মনে একরাশ আশা নিয়ে তিনি দিন গুনতে লাগলেন কিন্তু একমাস পরের যে ঘটনা তিনি আশা করেছিলেন, ঘটলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের এল করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। শয়ে-শয়ে মানুষ মরার খবর, অক্সিজেন নেই, ওষুধ নেই, বেড নেই... না আর খবর দেখতে পারলেন না বিভাদেবী। দুদিন পর অনির্বাণের ফোন এলো, "মা এবারের অবস্থা আরো খারাপ। অফিস বাড়ি দুদিক সামলাতে হচ্ছে। তোমাকে এখন আনা যাবে না তবে আমি তোমার কাছে যাবো। মা অপেক্ষা করো...." এই পর্যন্ত বলে ফোনটা কেটে গেল।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল অবস্থার উন্নতি তো দূর বরং অবনতি হল। অনির্বাণকে অনেকবার ফোন করেও না পাওয়ায় বিভাদেবী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমনকি তিন দিনের মাথায় তার একটা মাইল হার্ট অ্যাটাক হল, এবারেও বাড়ীর সাথে যোগাযোগ করা গেল না। বিভাদেবীর অবস্থার আরো অবনতি হল। সব হসপিটালে করোনা থাকায় তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। এদিকে বাড়ির সাথে যোগাযোগ তখনও সম্ভব হয়নি। তবে বিভাদেবী কিন্তু মৃত্যুশয্যায়ও তার বাড়ির লোকেদের মঙ্গলকামনা করে গেলেন, বারবার ভগবানকে বলতে লাগলেন, আমি জীবনে যা পুণ্য করেছি সব আমার ছেলেকে দিও ঠাকুর! ওর কোন দোষ নিও না।

এভাবেই সাত দিনের মাথায় তার দেহাবসান ঘটলো। মৃত্যুর পর বিভাদেবী দেখলেন দুজন তাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে, তাদের থেকে তিনি জানলেন তারা দেবদূত তাকে বৈতরণী পার করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা তাকে একটা খুব সুন্দর নৌকার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে বললো, "ওখানে উঠে যান।"

বিভাদেবী তাদের কথামতো নৌকাতে উঠতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার পা পিছলে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, সাথে সাথে পিছন থেকে কেউ একটা শক্ত করে তার হাত ধরে তাকে নৌকাতে নিয়ে বসালো।

বিভাদেবী নৌকায় বসে তাকে বললেন, "বাবা তুমি না থাকলে আমি পরেই যেতাম....

একি! খোকা তুই! তুই এখানে কী করছিস?"

অনির্বাণ: তোমাকে তো বলেছিলাম মা অপেক্ষা করো! আমি তোমার কাছে আসব। তুমি তো অপেক্ষা না করেই চলে এলে, তাই আমিও কথা রাখতে চলে এলাম।

বিভাদেবী: কী করে হল এসব? বৌমা, বাচ্ছারা কেমন আছে?

অনির্বাণ: মা ওরা বাড়িতে আছে, ভালো আছে। অফিসে গিয়ে আমার করোনা হয়, বাচ্চাদের ওদের মামার বাড়িতে পাঠিয়ে আমি হোম আইসোলেসানে ছিলাম। পিউ আমার দেখাশোনা করছিল, কিন্তু কিছু দিন পর আমায় হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। দিনে দিনে আমার অবস্থার অবনতি হয়, মা আমি ১৫ দিন ভেন্টিলেশনে থেকে বুঝেছি তুমি আমাদের থেকে দূরে থেকে কতটা কষ্ট পেয়েছিলে। আমি তোমায় যত কষ্ট দিয়েছি, হসপিটালের বেডে শুয়ে সবকিছুর প্রায়শ্চিত্ত করেছি। তারপর যখন সব কষ্ট থেকে মুক্তি পেলাম তোমার কাছে গেছিলাম, দেখলাম তুমি মৃত্যুশয্যায় থেকেও ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করছো। ভগবান আমায় ক্ষমা করে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে আসতে পেরেছি এবার তুমিও আমায় ক্ষমা করে দাও মা।

বিভাদেবী: আমি তো শুধু তোর জন্য বেঁচেছিলাম বাবা! তোর উপর আমি রাগ করতেই পারিনা। এবারে মা ছেলেতে একসাথে থাকব।

অনির্বাণ: তাহলে চলো মা, তোমার হাত ধরে তোমায় বৈতরণী পার করাই।

দিগন্তপারে

পল্লবী চক্রবর্তী

নমো নমো করে বিয়েটা হয়েই গেল বিমান বসাকের।

তেমন লোকজন বলেনি ওরা। প্রতিমার বাপ মদনের নেহাত মুদির দোকান, তাই চাল-ডাল আর তরিতরকারির অভাব হয়নি। তবে গয়নাগাটি কিছুই দিতে পারেনি। অবশ্য ওসব দিকে কোনো নজর ছিল না বিমানের। মাস তিনেক আগে ঘোষেদের পুকুরঘাটে স্নানরত অবস্থায় প্রতিমার গোলগাল মাখন মাখন চেহারাটাই তার নজর কেড়েছিল। তারপর থেকে হন্যে হয়ে থেকেছে। তবে প্রথমে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। বাব্বা! যা ডাঁট ঐ মেয়ের!

"অমন হাঁ করে কী দেখছিস লো? পুরো উদোম তো হইনি।" ফিক করে হেসে প্রতিমা বললো, "হ্যাট, আমি কি তাই বললুম? তুই বা অমন বুকের নীচে নামিয়েচিস কেন কাপড়খানা? কাকে দেখাতে চাস?"

"না রে না। এদিকে কে আসছে বল দিকিনি টিকলি? তাও আবার এই ভর দুকুরে? দেখচিস না কেমন ফাঁকা ঘাট।"

টিকলি চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, সত্যিই ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

"নে নে, আর শরম করিসনি, খুলে নাম দিকি।"

দুই বন্ধুর জলকেলিতে কেটে গেছে সারা দুপুর। দুই সোমত্ত উঠতি যৌবনা অপার বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে প্রকৃতির সাথে শরীরের মেলবন্ধন, সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত তার নতুনত্বের আভাস। একে অপরের অঙ্গ ছুঁয়ে পেলবতার স্বাদ নিয়েছে। প্রতিমা ফিসফিসিয়ে টিকলিকে বলে, "আচ্ছা টিকলি, বিয়ের পর বুঝি এভাবে সোহাগ করে?"

টিকলি দাঁত বের করে একগাল হেসে বলে, "পুরুষ মানুষে ছুঁলে এমনিভাবেই শরীলে রক্ত উথাল পাথাল করে।" সেই তপ্ত বৈশাখের দুপুরে দুই উন্মুক্ত বসনার কথা পুকুরের জল ছাড়াও আরো একজনের চোখে পড়েছিল। সিক্ত দুই স্তনের মাঝ বরাবর ঝরতে থাকা জলের মত রসালো হয়ে উঠেছিল বিমান বসাকের লকলকে জিভ!

দুপুরে ভোজ একটু বেশিই হয়েছিল। আলসে ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। তাকিয়া'তে ঠেস দিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম-ঘুম ভাব আসছিল। এমন সময় রতন এসে বললো, "বাবু, কে যেন এয়েছে, টাকা ধার চাইতে।"

বিমানের মনে হল একটা তেতো ঢেঁকুর উঠে আপাদমস্তক তেতো হয়ে গেল। হতভাগা মদন মোড়ল আবার এসেছে! আগেও এসেছে, তবে বিমান বসাক এক কানাকড়িও দেয়নি। বাটা থেকে আর একটা পান মুখে দিয়ে রতনকে বললো, "আসতে দে ব্যাটাকে, দেখছি।"

বহু কাকুতি-মিনতির পর হাজার দুয়েকে রফা করল বিমান। নমস্কার ঠুকে চলে যাবার সময় মদনের পিছু ডাকল বিমান।

"বলি ও মদন, শুনে যাও একটিবার।"

"আজ্ঞে কত্তা, বলেন।"

বেশ খানিকটা চুপ করে থাকার পর বিমান আমতা-আমতা করে প্রতিমাকে বিয়ের কথাটা পেড়েই ফেলল। মদন প্রথমটা আপত্তি করেছিল, প্রতিমা সদ্য উনিশে পা দিয়েছে, তায় গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইন অবধি পড়েছে। মা-মরা মেয়েটাকে এক্ষুনি পার করতে ইচ্ছা নেই মদনের। তার উপর এই বিমান বসাক লোকটাকে তার একদমই পছন্দ হয় না। খুব অসুবিধায় পড়েছে বলেই আজকে এ পথ মাড়িয়েছে মদন। নাহলে ...গোঁফে তা দিয়ে বিমান বলে উঠলো, "কি হে, কী ভাবলে? মেয়ের তো বয়স কম হল না। তার উপর গতরখানাও বেশ বাগিয়েছে। ঠাকুর না করেন, যদি কিছু একটা ঘটে যায় ..."

ভয়ে ঢোঁক গেলে মদন। লোকটার কথাবার্তা মোটেই সুবিধের নয়। এই কিছুদিন আগেই তো ও পাড়ার হারু আর গোবলা গুন্ডা এসে শাসিয়ে গেছে। মনে মনে প্রমাদ গুনল মদন। রাজি না হলে আবার ... তবে, হোক আধবুড়ো, বিমানের টাকা পয়সা নেহাত কম নয়। বিয়ে হলে মেয়েটার খাওয়া পরার কোনো অভাব থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে খানিকটা ভয়ে খানিকটা বাধ্য হয়ে অগত্যা মদন নিমরাজি হল।

রাত্রে বিমানের স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় প্রতিমা। অমন রসালো গড়ন আর মাপা চেহারা ঘামিয়ে তোলে বছর পঞ্চাশের বিমান'কে। হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে প্রতিমার শরীরের প্রতিটি ভাঁজ। টাটকা কচি ঘাসের মত নরম। এবার কালীপুজোতে মেয়েটাকে বিমানের শখের বাগানবাড়িতে নিয়ে আসার মতলব খানা বানচাল হয়ে গেছিল। হারু, গোবলাকে বলাই ছিল, অন্ধকারে বস্তাতে পুরে আনতে। ওই মেয়ে মোটেও সুবিধার নয়, এইসা ঘুষি মেরেছিল গোবলাকে, এক হপ্তা এ বাড়ি-মুখো হয়নি। বিমান হাসি টেনে নিয়ে মনে মনে বললো, "এই বারে পাকা ব্যবস্থা করেছি। পালাবি কোথায় প্রতিমা!"

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। বাড়ির দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বিরসবদনে বসেছিল রতন। গত কয়েকদিন ধরেই জ্বর-জ্বর ভাব। মুখে কিছুই রোচে না। কর্তাবাবুকে বলে কয়েকদিনের ছুটি নেবে ভাবছে। রান্নাঘরে গিয়ে দুটো চালে ডালে চড়িয়ে দেয় রতন। বাপটাকে কিছু না খাওয়ালে নিজেও কিছু খেতে পারবে না। সেই কোন ছোটবেলায় মা মরেছে। বাপও বছর দুই আগে কাঠের কারখানায় কাজ করতে গিয়ে এক পা খুইয়েছে। এখন ঐ দোকানের কাজ আর বিমান বসাকের ফাই-ফরমাস খাটা। যা হোক, দু'পয়সা আয় হয়। বিমান বসাক লোকটা সাংঘাতিক। কিন্তু কি করা যাবে, রতনের কপাল! না খেয়ে মরতে বসেছিল, পাশের বাড়ির বিন্তি মাসি তাই দেখে জোর করে একরকম নিয়ে যায় বসাক'দের বাড়ি। তারপর কত্তাবাবুর সাথে কথা বলে কাজে লাগিয়ে দেয় তাকে।

দেওয়ালে টাঙানো লক্ষ্মী ঠাকুরের জীর্ণ ফ্যাকাশে ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখে জল এলো রতনের। লক্ষ্মী ঠাকুরের মুখের আদলখানি ঠিক যেন তার মায়ের মত। রতনের মনে আছে সেবার কালীপুজোতে অনেক কষ্টে বসাকদের বাড়ি ধান ভেনে মা টাকা পেয়েছিল। তাই দিয়ে রঙিন বাজি কিনে এনেছিল। রতনের তখন আনন্দ দেখে কে! সন্ধ্যেবেলায় নিজের হাতে বানানো প্রদীপ দিয়ে সাজিয়েছিল সারা ঘর। ছোট রতনও হাত লাগিয়েছিল মায়ের সাথে। তার একটু পরেই বসাক বাড়ি থেকে ডাক এলো। রতনের, মা'কে একটুও ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। মা আদর করে বলেছিল, "কত্তা বাবুর কিছু টাকা দিতে বাকি আছে, নিয়েই চলে আসবো।"

কিন্তু, তারপর আর ফেরেনি। সারারাত মায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল রতন। বাজিগুলো পড়েই ছিল দাওয়ায়। বাবা, মাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। দুদিন পরে ঘোষেদের পুকুরের পাশের আমবাগানে রতনের মাকে পাওয়া যায়। ওদের পাড়ার পটলার মা স্নান করতে গিয়ে দেখে প্রথম। নাহ্, রতন দেখতে পারেনি মায়ের অমন আধপোড়া শরীরটা। বিন্তি মাসির কোলে মুখ লুকিয়েছিল। সেদিন সবাই কেঁদেছে, খালি বিন্তি মাসি ছাড়া। মুখখানা ভার করে থাকে এখনও মায়ের কথা বললে। আর ভাবতে পারে না রতন! খিচুড়িটা হয়ে এসেছে। চটপট নামিয়ে নিয়েই বাবাকে হাঁক পাড়ে।

লাল টুকটুকে জরির কাপড়ে প্রতিমাকে বেশ লাগছিল। গায়ের রঙ শ্যামলা হোক, মেয়েটার মুখখানা ঠাকুর ঠাকুর। ঘোমটা ঢাকা একমাথা সিঁদুর নিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই বড় চৌকাঠে হোঁচট খায় প্রতিমা। নখের কোণ ভেঙে বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে। মুখ নীচু করে বসাক বাড়িতে পা রাখে প্রতিমা। কেউ লক্ষ্যই করেনি ওর রক্তাক্ত পা। শুধু একজন ছাড়া। বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। শুধু বুকের ভেতরটা কে যেন দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছিল। বিমান বসাকের নোংরা দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পারার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। বসাকদের পেল্লাই বাড়ি। লোকজন কেউ নেই। সারা দুপুর জানলার সামনে বসে কাটিয়েছে প্রতিমা। শীতের মিঠে কড়া রোদে গা এলিয়ে দেয়। ভারী শরীরের আবরণ খসে পড়ে ওর গা থেকে। রোদের আভা ছুঁয়ে যায় প্রতিমার পিঠ, উন্মুক্ত বুকের ভাঁজ, নাভিমন্ডল। আজও দূরে কোথাও 'বউ কথা কও' ডাকছে। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। প্রতিমা বরাবর স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এসেছে। রামু মাস্টার শেষদিন ক্লাসে তাকে ডেকে বলেছিল, "প্রতিমা, অন্যায় দেখে কখনো চুপ থাকবি না। জানবি, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, দুজনেই সমান অপরাধী।"

প্রতিমা ভাবে, তবে সেও তো অপরাধী! বিমান বসাকের সম্বন্ধে কিছুটা হলেও শুনেছে সে। ভয়ঙ্কর শয়তান লোকটা। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে গিয়ে চোখ ভরে ওঠে জলে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে ঘোর ভাঙলে প্রতিমা দেখে রতন এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি'তে খোলা কাপড় সামলাতে না পেরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে প্রতিমা। কোনো মতে আঁচল ঢেকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, "কিছু বলবেন?"

রতন অপ্রস্তুতে পড়ে যায় প্রতিমাকে ঐভাবে অর্ধনগ্ন দেখে। চোখ নামিয়ে নেয় মুহূর্তেই। এক সুবাসিত হাওয়া খেলা করে বেড়ায় ঘরে। মেয়েটা কে? কেনই বা মরতে এলো এই নরকে? এক ঝলক দেখে রতনের কেমন একটা লাগলো। যৌবনচ্ছল প্রাণবন্ত। পিঠের উপর এলিয়ে ঘন কোঁকড়ানো চুল। পাতলা দুটি ঠোঁট। তবে সবথেকে বেশি মুগ্ধ করে মেয়েটার বড়ো মায়া ভরা চোখ দুটো। নীরবতার মাঝে দুজনের অজান্তেই কোথাও কিছু কথা আদানপ্রদান হয়ে যায়। রতনের চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠা সদ্য পৌরুষের আভা মিশে যায় প্রতিমার লজ্জারাঙা গালে।

"বলছিলাম এই দুব্বোঘাস কিছু তুলে থেঁতো করে এনেছি, আসার সময় ঐ চৌকাঠে লেগেছিল আপনার পায়ে, দেখলাম; দুব্বোঘাসের রস দিলে উপকার পাবেন।" রতনের মুখের আপনি ডাক শুনে লজ্জা পেল প্রতিমা। তার মানে ওর এই ছোট্ট আঘাত রতনের চোখ এড়ায়নি! বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো হাত পেতে নিয়ে নেয় প্রতিমা। কিন্তু কিছু বলার আগেই রতন খানিক তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যায়। প্রতিমার মনে হয় কিছু যেন বলি বলি করেও বললো না রতন।

বিয়েতে তেমন কিছুই দিতে পারেনি মদন, কেবল প্রতিমার মায়ের একজোড়া কানের দুল ছাড়া। ঐটুকু শেষচিহ্ন ছিল কমলার। যাক মেয়েটা সুখে থাকুক। চলে যাওয়া ইস্তক ঘরখানা কেমন খাঁ খাঁ করছে। কষ্টে হোক, যত্নে মানুষ করেছিল মেয়েকে। যেই দেখতো, সেই বলতো, "মুখখানা কেমন লক্ষ্মী পিতিমের মত।" "হা ঈশ্বর! রক্ষা করো মেয়েটাকে।" কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ে মদন। কে জানে ওইটুকু ফুলের মত মেয়েকে নিয়ে নরপিশাচটা কী করবে! আফসোসে হাত কামড়ায় মদন।

লোকজন তেমন না হলেও বিয়েবাড়ি বলে কথা। তাই সকাল থেকে রতন ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। কত্তা বাবুর বিয়ের একদিন হলো। উপরের এই দিকে কখনও আসেনি রতন। কত্তা বাবুর বারণ থাকে সর্বদা। বিন্তি মাসির থেকে চাবির গোছাখানা একেবারে কোমরে গুঁজেই নিয়ে এসেছে। কাজ শেষ করে চলেই আসছিল প্রায়। এমন সময় চোখে পড়ল দক্ষিণের ছোট বন্ধ দরজাটা। মাথা চুলকে রতন ভাবে, "এই রে, এই ঘর টা যে পরিষ্কার হলো না!" বিন্তি মাসি যদিও পই পই করে রতনকে শিখিয়েছে, ভুলেও এ দরজা না খোলার। তবু.... চাবির গোছা থেকে একটার পর একটা চাবি নিয়ে চেষ্টা করেই যাচ্ছে রতন। একটাও লাগছে না। কৌতূহল আর ভয় বেড়েই চলেছে। কী এমন আছে এই ঘরে? এত দিন কাজ করছে এ বাড়িতে, কেন এদিকে কত্তাবাবু ছাড়া কেউ আসে না? এমন সময় কানে আসে বিন্তি মাসির গলা, "ওরে ও রতন, কোথায় মরলি হতভাগা! শিগগির আয়! কত্তা বাবু ডাকলেন।" হঠাৎ করেই বিন্তি মাসির বাজখাঁই আওয়াজে পিলে চমকে যায় রতনের। তালাটা ধরে দেখছিল তখন। ভয়ের চোটে দুম করে মুঠো করে চেপে ধরে তালাটা। তারপরই হঠাৎ রতনকে অবাক করে আদ্যিকালের একটা বিশ্রী আওয়াজে খুলে যায় তালাটা।

তালা খুলে ঢুকতেই বিষম খেল রতন। যেমন স্যাঁতসেঁতে, তেমনি অন্ধকার। আর ধুলোর পরতে ঘরের রং বোঝা দায়। কাজে লাগার পর থেকে এ ঘরে একবারও ঢোকেনি রতন। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে তেমন কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। এই বদ্ধ ঘরে কী-ই বা থাকতে পারে! তবে রতনের হাত খুব পাকা, ঝাঁটা কাপড় নিয়ে পরিষ্কার করতে লেগে পড়ে রতন। জানলা খুলে দেয়। উত্তুরে

তাজা হাওয়া ঢোকে ঘরে। তখনই মেঝেতে পড়ে থাকা বেশ কিছু পুরোনো বাক্স চোখে পড়ে রতনের। ঝুল-ধুলো সরিয়ে দেখতে যায় ও।

এমনিতেই রতনের মন মেজাজ ঠিক নেই। কেমন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে মেয়েটাকে দেখে। ওই বুড়োর পাশে এক্কেবারে বেমানান। মুখ আর চোখের দীর্ঘ পাতায় কেমন বিষাদ জুড়ে। আচ্ছা, মেয়েটা কি সব জানে বিমান বসাকের সম্পর্কে? মেয়েদের যে একেবারেই মানুষ জ্ঞান করে না লোকটা। মনটা ভারী হয়ে ওঠে অজান্তেই। নাহ, মেয়েটার ক্ষতি ও হতে দেবে না। কত্তাবাবু কিছু করার আগেই মেয়েটাকে জানাতে হবে লোকটার সম্মন্ধে। এসব সাতপাঁচ ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্কতায় হুড়মুড়িয়ে রতনের হাত থেকে পড়ল একটা ভারী বাক্স! মনে মনে প্রমাদ গোনে রতন। বিন্তি মাসির কান সজাগ। নির্ঘাত শুনতে পেয়েছে, এক্ষুনি এলো বলে! তড়িঘড়ি করে বাক্সের জিনিসপত্র তুলে রাখতে যায় রতন। ঠিক তখনই রতনের হাতে লাগে ভাঙ্গা কাঁচ। আঙুলে ঢুকে গেছে। ব্যথায় চোখ বন্ধ করে নিতে গিয়ে দেখে পাশেই পড়ে আছে একটা পুরোনো কাঁচের বোতলের অংশ।

"এত দামী বাক্সে কেউ ভাঙ্গা বোতল রাখে?" রক্তলাগা আঙুল থেকে কাঁচের টুকরোটা বের করে রতন। তারপর কৌতূহলবশত বোতলটা হাতে নিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে মরচের মতন কেমন লালচে বাদামি গুঁড়ো লেগে সেটায়। হাতে নিয়ে নাকের কাছে শুকতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রতনের। এ তো শুকিয়ে যাওয়া রক্ত! ভয় আর কৌতূহলে মিশিয়ে বাক্সের ভিতরে উঁকি মারে। বাইরে বিন্তি মাসির পায়ের আওয়াজ ...! রতনের দেরি দেখে নিজেই চলে এসেছে বিন্তি মাসি। খোলা দক্ষিণের ঘর দেখেই আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে বিন্তি মাসির। বিড়বিড়িয়ে ঠাকুরের নাম জপে। হে রাধামাধব! এতদিন সামলেছি, আজ রক্ষে করো তুমি! পা টিপে টিপে দরজায় এসে দাঁড়ায় বিন্তি মাসি।

ঘরের মধ্যে তখন ভয়ে বিস্ময়ে থর থর করে কাঁপছে রতন। বাক্সের ভিতরে থাকা একছড়া হার আর একফালি ছেঁড়া কাপড় হাতে রতনকে দেখে বিন্তির চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়! সব শেষ। ডুকরে কেঁদে ওঠে বিন্তি,"শিউলি রে এ এ..."

হঠাৎ কান্নার শব্দে ঘর ঘুরিয়ে রতন দেখে কপাল চাপড়ে কাঁদছে বিন্তি মাসি। এই প্রথমবার বিন্তি মাসিকে কাঁদতে দেখে রতনের বুঝতে ভুল হয়না কিছুই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিন্তি বলে ওঠে, "ভগবান আছে রতন ...দেখিস!"

রতন কেবল অস্ফুটে বলে ওঠে,

" মা...! মাগো...!"

আজ প্রতিমার বৌভাত। এখানে এসে একমাত্র বিন্তি মাসিকেই সে ভালোমত চিনেছে। অনেক বছরের অনেক পুরোনো কাজের

লোক। “বিন্তি মাসি! ও বিন্তি মাসি! শুনে যাও দিকি একবার এদিক পানে ...।”

খানিক বাদে কড়া নাড়ার আওয়াজে প্রতিমা দরজা খুলে দিতেই দেখল রতন দাঁড়িয়ে। “তুমি এলে যে! আমি তো বিন্তি মাসি কে ...”

অকস্মাৎ আপনি থেকে ‘তুমি’তে পরিবর্তনে র তে বানিয়েছে মেয়েদের। রতন বুঝতে পারছে ওর ভিতরটা যেন একটু একটু করে পড়ে ফেলছে প্রতিমা। অদম্য হয়ে ওঠে রতন। পড়ুক! ও প্রতিমাকে কিছুতেই ওই শয়তানটার হাতে তুলে দিতে পারবে না। এবার সময় এসে গেছে চরম শাস্তি দেওয়ার। প্রতিমা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রতনের দিকে। শরীরের ভিতরে প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে রক্তের উদ্দাম খেলায়। এক অসম্ভব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রতিমার মনে।

বৌভাতের অনুষ্ঠান চুকে গেলে বিমান, রতনকে দিয়ে আনানো বিদেশি মদের বোতল খুলে বসলো। সঙ্গে রতনেরই বানানো ঝাল ঝাল কষা মাংস। “বেড়ে বানিয়েছে রতনটা। অনেকদিন পরে এরকম সুখ। আহা!...” বিমানের মেজাজ আজ ফুরফুরে। মদনের মেয়েটা সত্যি খাসা মাল। কিছুদিন আশ মিটিয়ে নেওয়া যাক। তারপর গোবলাকে দিয়ে একটা কিছু গতি করিয়ে নিলেই হবে। টাকায় সব হয় বাওবা.....”

মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে বিমানের। নাহ্, অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে বোধহয়। যাক! এদ্দিন পর বাগে আনতে পেরেছে প্রতিমাকে। বিয়েটা তো শুধু লোকচক্ষুর সামনে। আসলে তো ওই মেয়েকে ... হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ... আজ চুটিয়ে সুখ ভোগ করবে বিমান।

কিছুক্ষণ আগেই অন্ধকারে সন্তর্পনে রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিল প্রতিমা। বিন্তি মাসি পইপই করে বলেছে আজ না বেরোতে। তবুও রতনকে ওভাবে দেখার পর থেকে কেমন অশান্ত লাগছে। ওভাবে কী বোঝাতে চেয়েছিল রতন? তারপর থেকেই আর দেখা নেই কারুর। খুঁজতে খুঁজতে হেঁসেলে এসেছে প্রতিমা। রান্নাঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, তার টিমটিমে আলোয় দুজনের চেহারা বুঝতে অসুবিধে হল না প্রতিমার। আড়াল থেকে যা শুনল প্রতিমা, ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। এই তবে রতনের ইঙ্গিত ছিল? এত নিষ্ঠুর পাষণ্ড এই বিমান বসাক লোকটা? মানুষ না শয়তান? আর তারই সাথে আজ কিনা... ছি ছি! এই কারনেই তবে রতন ওভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে?

দুঃখে কষ্টে জর্জরিত প্রতিমা কেমন পাথর হয়ে যায়। নাহ্ এখনও সময় আছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার, এটাই হয়ত ওর প্রথম আর শেষ সুযোগ!

“ও মেরে দিলকে চ্যান ...” প্রিয় গানের কলি গাইতে গাইতে উঠল বিমান। মাথাটা বেশ টলছে। হারু, গোবলাও ঝিমোচ্ছে। পায়ের জুতোটা দিয়ে ঠ্যালা মেলে বিমান জড়ানো গলায় ডাকলো, “ অ্যাই সব মাতালের দল, চোখ কান খোলা রাখিস। হেহে হে হে এ এ এ .... আমি গেলুম তবে .....” নেশার চোটে বিমান খেয়াল করলো না যে ওর থেকেও খারাপ অবস্থায় প্রায় অর্ধ চৈতন্য হয়ে পড়ে আছে হারু আর গোবলা। “সুন্দরী গো ও ও ... হেঁ হেঁ হেঁ পতিমা রে এ এ ...” আপাদমস্তক মদে টইটুম্বুর বিমান এগোলো ঘরের দিকে। পিছনে তাকিয়ে বাকি অবস্থাটুকু বোঝার প্রয়োজন মনে করলো না। বড় বারান্দার থামের আড়াল থেকে দুটো চোখ সন্তপর্নে সরে গেলো ।

খাটের কোণায় জড়সড় হয়ে বসেছিল প্রতিমা। শাড়ি, টুকটাক গয়নার ভারে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বিন্তি মাসি পরিয়ে দিয়েছে। তার থেকেও অস্বস্তি হচ্ছিল নিজের কপালের কথা ভেবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা! নাহ্, কিছু তো একটা করতেই হবে। হয় এসপার, না হয় উসপার। বুকের ভেতর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ক্ষোভ যেন প্রতিশোধের জ্বালায় মত্ত হয়ে ওঠে। রতনের মুখ আর বিন্তি মাসির বলা কথাগুলো লাভা সঞ্চার করে প্রতিমার মনে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিমা তৈরি হতে থাকে ভিতরে ভিতরে। নারী ভালবাসায় যেমন উর্বশীর মত রূপে নিজের শৃঙ্গার করে, হিংস্রতায় তেমনই মহা চণ্ডীর দানবী রূপ ধারণ করে। বিমান বসাকের দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তেমন কোনো ধ্যান-ধারণা বোধহয় ছিল না।

টলতে টলতে ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে থাকা প্রতিমার দিকে এগিয়ে এসে থুতনি ধরে নেড়ে দেয় বিমান। উৎকট মদের গন্ধে গা

গুলিয়ে ওঠে প্রতিমার। গা ঘেঁষে বসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে চায় বিমান প্রতিমাকে। নেশার ঘোরে কেমন আবছা লাগছে সবকিছু। ঘরে এত অল্প আলোয় ঝাপসা হয়ে আসে বিমানের চোখ। বাইরেও যেনো আলো কম ছিল বলে মনে হয় বিমানের। এই রতনটা না! কাজ থেকে ভাগাতে হবে এবার।

হাতড়েহাতড়ে প্রতিমার শরীর স্পর্শ করতে চায় বিমান। "মো-ও-ও-র প্রি-ই-ই-য়া হবে এ-এ-সো রা আ আ...." কথা শেষ হতে না হতেই সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা মারে প্রতিমা। টাল সামলাতে না পেরে বিছানাতেই ঘুরে পড়ে বিমান। আর দেরি নয়, এইবার মোক্ষম সুযোগ! অসহায় রতনের মুখটা ভেসে উঠতে বিমান বসাকের বুকের উপর বসে বেপরোয়া ক্ষিপ্র বাঘিনীর মত দু'হাতে বিমানের গলা টিপে ধরে প্রতিমা। বিমান বসাক আর যাই হোক, এটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

"শালা জানোয়ার, রতনের মাকে মেরেছিলিস কেন? কী দোষ করেছিল সে? বল .. বল শয়তান?" মদের ঘোরে কিছু ঠাহর করার আগেই প্রতিমার হাতের আঁচরে কেটে যায় গালের পাশ। বিস্ময়ে 'থ' হয়ে যায় বিমান। মাথাটা বেশ ভোঁতা লাগছে। প্রতিমা জানলো কী করে এসব!! কী করে!! তবে কি বিন্তি কোনোভাবে ....? বিমানের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে সবটা। রতনের হাবভাব, হারু, গোবলার ঐভাবে পড়ে থাকা, আর রাতের এই অন্ধকার ।

হিসিহিসিয়ে ওঠে বিমান, "চুপ শালী, একদম চুপ .. বেশ করেছি মেরেছি! খুব রূপের দেমাক ছিল রতনের মায়ের। সোজাসুজি কথায় রাজি হয়নি, তাই শেষ করে দিয়েছি একেবারে! এই বিমান বসাক সও ও ও ব পারে এ এ .. হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ.."

রাগে অন্ধ হয়ে যায় প্রতিমা। চরম ঘৃণার লেলিহান শিখায় আহত সিংহীর মত সজোরে লাথি মারে বিমান বসাকের বুকে। তখনই চোখে পরে শ্বাপদের ন্যায় উঁচিয়ে থাকা পুরুষাঙ্গটা ।

"খুব শখ তোর মেয়ে-মানুষদের চেখে দেখার, না ??" দেখ এবার! এই মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল প্রতিমা। চোখের পলকে খোঁপা থেকে বের করে নেওয়া চুলের কাঁটা গিঁথে দেয় বিমানের উদ্ধত পুরুষাঙ্গে। ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে বিমান বসাক। এইটুকু মেয়ের এত জোর কোত্থেকে এলো! যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বোঝার চেষ্টা করে প্রতিমার পদক্ষেপ। কোনরকমে অর্ধেক চোখ খুলে সামনে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে বিমান। এ কে! এ কাকে দেখছে ও? এতো প্রতিমা নয় ...ছোট চোখ দুটো যন্ত্রণা ভুলে ভয়ে আতঙ্কে ঠিকরে ওঠে... বিমানের গলা চিরে একটাই শব্দ বের হয়, "..... শ শ ই ই শি উ উ লি ই ই ... !!" আধো অন্ধকারে প্রতিমা আর শিউলি এক হয়ে যায় ।

হিংস্র হয়ে ওঠে বিমান ...অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পায় সঙ্গে আনা মদের বোতলটা। "তবে রে শালী, এই বিমান বসাককে শেষ করা সহজ নয়।" আত্মরক্ষার জন্য সদ্য দেখা অবয়বটার মাথা লক্ষ্য করে শেষ আঘাত হানে বিমান। কিন্তু তার আগেই ভেসে আসে আর্ত চিৎকার ... " আ আ আ আ আ .. হ হ হ হ "

নাহ্ শেষরক্ষা হলো না। বিমানের উদ্যত হাত সমেত শরীরটা উল্টে পড়ে যায় মেঝেতে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যায় প্রতিমা। তখনও শরীর থর থর করে কাঁপছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় প্রতিমা। ঘরের এই আলো আঁধারির মধ্যে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রতনের দিকে।

মৃত বিমানের আধ খোলা চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে মুখ ঢাকে প্রতিমা। মুখ থেকে বাক্য সরছে না কারোরই। নীরবতা ভেঙে রতন বলে ওঠে, "আপনাকে ওভাবে মারতে গেছিল দেখে আমি .... যাই হোক, শয়তানটা যোগ্য শাস্তি পেয়েছে"

"কিন্তু তু-তু-তুমি কী করছিলে এখানে?"

মৃদু হেসে রতন বলে, "রান্নাঘরে যে তখন আপনি আড়ি পেতেছিলেন, সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। তাই আগে থেকেই এই জানোয়ারটার খাবারে নেশার ওষুধ মিশিয়ে ছিলাম। আমি জানতুম, একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে, তাই দরজার বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলাম।"

"আমার জন্য ???"

রতন এরপর আর কোনো কথা বলে না। এক চোখের কথা অন্য চোখে ভাসে প্রশ্নোত্তরের খেলায়। বাকি অন্ধকার নিস্তব্ধে প্রহর গোনে।

ধস্তাধস্তি চিৎকারের আওয়াজ শুনে বিন্তি মাসিও ছুটে এসেছিল। মেঝেতে পড়ে থাকা বিমান বসাককে দেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন। তবে রতন বা প্রতিমা কেউই বিন্তি মাসির আসা টের পায়নি।

"ও রতন, এ যে এক্কেরে শেষ হয়ে গেল বাছা!"

চটক ভাঙ্গে দুজনের। অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে রতন,

"হ্যাঁ মাসি। পাপের ঘড়া যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বিমান বসাকের। লক্ষী যে আজ স্বয়ং মহামায়া রূপ ধারণ করেছিল।"

প্রতিমাকে লক্ষ্য করে বিন্তি বলে ওঠে, "ঈশ্বর তোমায় পাঠিয়েছিল গো। নইলে কি আর এমন ভাবে ... বড় ভালো মানুষ ছিল গো আমাদের শিউলি। আমাকে ভয় দেখিয়ে কেবল মুখ বন্ধ করে রেখেছিল ওই পাষণ্ড! কোথা থেকে সেদিন কি হয়ে গেছিল!" হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো বিন্তি।

"মাসি, আমি তো সব শুনেছি গো, তাই তো এমন করে ...তবে রতনবাবু না থাকলে হয়ত..."

"আমাকে ক্ষমা করিস রতন। ক্ষমা করিস!"

বিন্তি বলে ওঠে, "পালা বাবা পালা। এখানে আর থাকিস না। এদিকটা আমি সামলে নেব। পারলে এই পোড়া কপালী'টা কেও

সঙ্গে করে ...”

রতন দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল। বিন্তি মাসির কথা শুনে থমকে যায়। প্রতিমা শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রতনের দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রতিমার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে রতন বলে, “আপনার কাছে অনেক ঋণ... বাকি জীবনটা শোধ করার সুযোগ দেবেন কি?”

পূবের আকাশ সূর্যের উদীয়মান আভায় লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কুয়াশার পরত ভেঙে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে চারিদিক। দুই বিধ্বস্ত শরীর এসে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে। অনির্দিষ্ট কালের যাত্রার অপেক্ষায়। আরেক নতুন দিগন্ত খুঁজে নিতে।

দিগন্ত পারে দুটি অবয়ব হাতে হাত রেখে এগিয়ে যায় নতুন সকালের ঠিকানায়। অন্যায়কে দমন করে, শুভ শক্তির উত্থান ঘটিয়ে। পিছনে পড়ে থাকে পোড়া কপালের করাঘাত, ছোটবেলা, এক টুকরো অতীত আর...।।

টাটকা টাটকা : অলিম্পিক ২০২৪-এ ভারত

ভারত ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অংশ নেয় ফ্রান্সের প্যারিসে যা ২৬শে জুলাই থেকে ১১ই আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সাল থেকে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের প্রতিটি সংস্করণে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত হয়েছেন এবং ২০১৪ প্যারিস অলিম্পিক গেমস ভারতের ২৬ তম উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে।

এই বছরের গেমগুলির জন্য ভারতীয় দলে ১১৭ জন ক্রীড়াবিদ ছিলেন, ১১০ জন প্রতিযোগী এবং ৭ জন বিকল্প। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি.ভি. সিন্ধু ও টেবিল টেনিস তারকা শরৎকমল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পতাকাবাহী ছিলেন। শুটার মনু ভাকের এবং ফিল্ড হকি দলের গোল রক্ষক পি.আর.শ্রীজেশ সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পতাকাবাহী ছিলেন। ভারত একটি রুপো এবং পাঁচটি ব্রোঞ্জসহ মোট ছয়টি পদক অর্জন করে।

* প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ পদক তালিকায় ভারত ৭১তম স্থান অধিকার করেছে।

সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
০	১	৫	৬

নীরজ চোপড়া ৮৯.৪৫ মিটার থ্রো করে জ্যাভলিন রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। এটি ছিল তার দ্বিতীয় অলিম্পিক পদক।
মনু ভাকের প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ব্যক্তিগত এবং মিশ্র ইভেন্টে পদক লাভ করেছেন।
লক্ষ্য সেন অলিম্পিকে পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে সেমিফাইনালে পৌঁছে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে হেরে গিয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন।
কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের লড়াই-এর পর ফাইনালে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাইনালের দিন ১০০ গ্রাম বেশি ওজনের জন্য তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।এর পর ফাইনালে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাইনালের দিন ১০০ গ্রাম বেশি ওজনের জন্য তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

তাছাড়া, সম্প্রতি শেষ হল প্যারা অলিম্পিকস, যা ২৮শে আগস্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিকে ভালো ছিল একাত্তর নম্বরে। অলিম্পিকে ভারতের র‍্যাঙ্ক ১৮। নিঃসন্দেহে এক অসামান্য কৃতিত্ব। প্যারা অলিম্পিক হল শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম। তাদের গোটা জীবনটাই খুব কষ্টের। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। সেই প্রতিফলনই দেখা গেল মেডেল তালিকায়।

সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
৭	৯	১৩	২৯

নম্বর মিলিয়ে ছবি সম্পূর্ণ করো ও মনের মত রং করে ফেসবুকে **#KheyalKhusi** লিখে পোস্ট করো। **@zealnotion আথবা @KheyalKhushi** - তে আমাদের ট্যাগ করতে ভুলো না কিন্তু

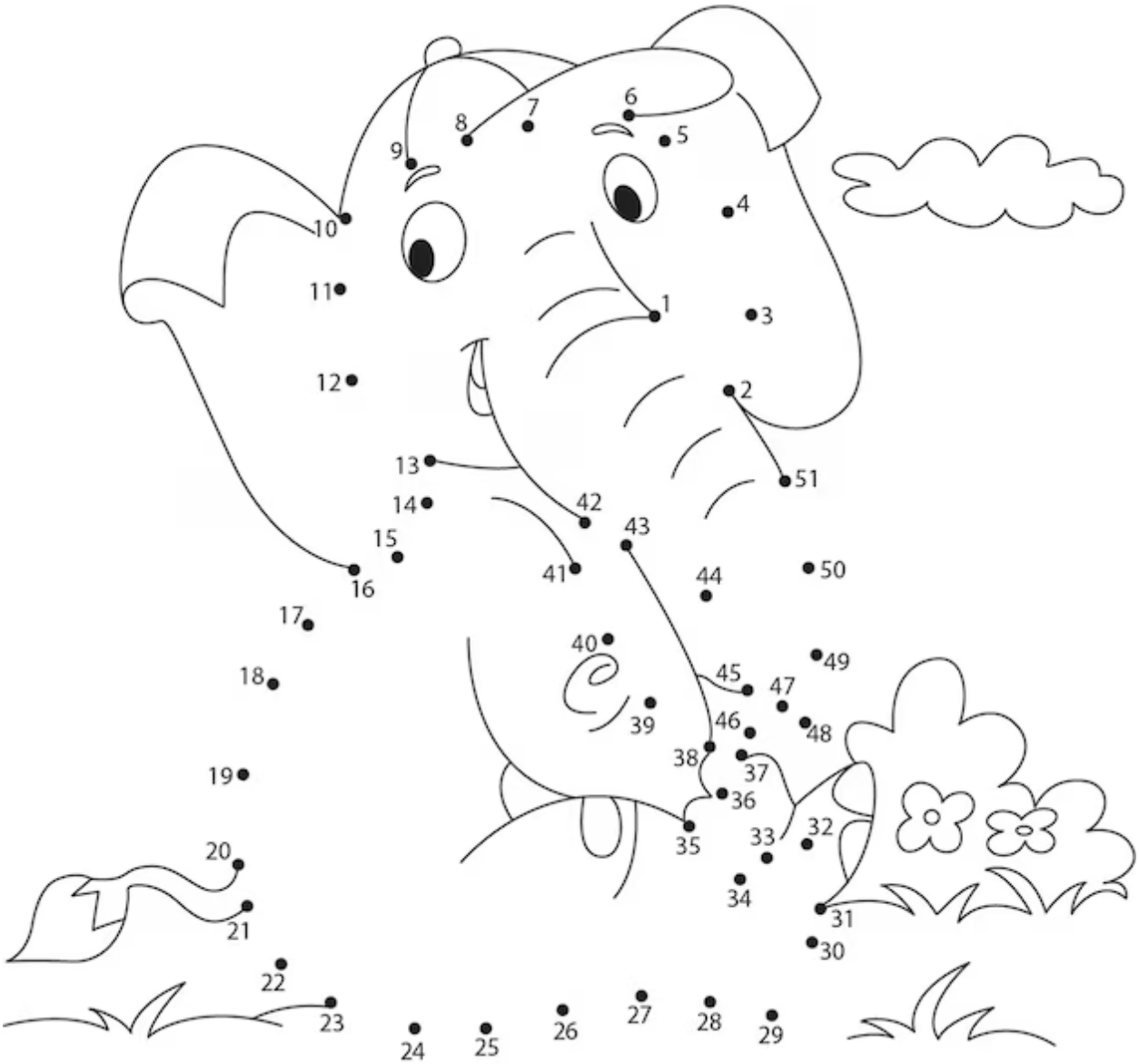

A.C CLASS ROOM

LINCOLN ACADEMY
ESTD - 2018
* ENGLISH MEDIUM * JOYNAGAR MOZILPUR *

LINCOLN ACADEMY

ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Following C.B.S.E. Curriculum

Play Group to Class- X

Admission Open for 2025 -2026

A.C CLASS ROOM

Address:- 28/3 Thakurpara Road,
PNB Building, JaynagarMazilpur, 24 Pgs (S),
Ph:- 9163757948 / 03218-228010

বিশ্বস্থ বন্ধকী প্রতিষ্ঠান

Mob.: 8637534155
9477805583

ভবানী জুয়েলার্স

এখানে পুরাতন সোনা ও
রুপার গহনা ভাঙ্গিয়া
নতুন ডিজাইনের গহনা
তৈরী করা হয়।
22/22 C KDM গহনা
তৈরী করা হয়।

নতুন শোরুম

স্থান- মজিলপুর বেলে রোড
(জে.এম ট্রেনিং স্কুল মাঠ সংলগ্ন) দঃ ২৪ পরগণা

খেলায় ছলে — শব্দবাণ

সাঁ ১	ঝ ২		কু ৩	
	গ ৪	র	মি	ল
পা ৫	ড়া		র	
য়ে		মা ৬		টিঁ ৭
স ৮	ং		মো ৯	য়া

সুদোকু

1	6	9	7	5	2	3	8	4
8	5	2	4	3	9	7	1	6
7	4	3	8	6	1	9	5	2
6	9	5	2	1	8	4	3	7
3	7	1	6	9	4	5	2	8
2	8	4	3	7	5	1	6	9
9	1	6	5	2	7	8	4	3
5	2	8	9	4	3	6	7	1
4	3	7	1	8	6	2	9	5

খেলার ছলে অঙ্ক কষো

২১	=	৩	+	৪	÷	৭		
৩	=	৬	-	৮	×	৭		
৩০	=	৬	-	৮	×	৭		

ছবি দেখে শব্দ লেখো

খে ১	লো	য়া	ড়
লা ২	ল	কে	ল্লা
ধূ ৩	প	ধূ	নো
লা ৪	ল	ঝুঁ	টি

তফাৎ চেনো

১. ল্যাম্প শেডের রং আলাদা
2. পেছনের তাকে বাঁদিকের ছবিতে গাছ ও অন্যটিতে বই আছে
3. চুলের রং আলাদা
4. জামার রং আলাদা
5. একটি সোফার হাতলে তোয়ালে রাখা অন্যটিতে নেই
6. জুতো ও মোজার রং আলাদা
7. মেঝের রং আলাদা
8. দেওয়ালের নীচের বর্ডারের রং আলাদা

ইঁদুরটিকে চিজ অবধি পৌঁছাতে সাহায্য করো

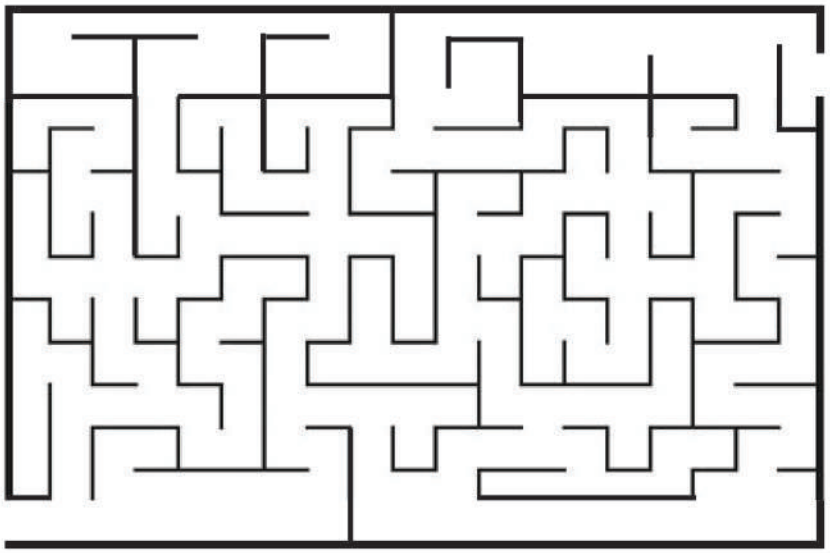

আজব ব্যাপার

আজব ব্যাপার : ১

বাংলায় রমাকান্ত কামারের সাথে তো সবার আত্মিক সম্পর্ক আছে, তাই না? কিন্তু তোমরা যারা ছোটোরা আছো, তারা কি জানো কেন এই রমাকান্ত কামার বিখ্যাত? কারণ এই নামটি সামনে থেকে এবং পিছন থেকে সমানভাবে পড়া যায় অর্থাৎ উভয় দিক থেকে পড়লেই একই নাম আসবে। আমি সময় দিচ্ছি; আরেকবার ঝপ করে পড়ে নাও। এবার বলো ঠিক কিনা! এই মজার বিষয়টির নাম প্যালিনড্রোম। বাংলায় কিছু শব্দ ও বাক্য এমনকি নামও পর্যন্ত আছে, যাদের উভয় দিক থেকে পড়লে একই মনে হয়।

তেমনই কিছু বাক্য আছে। যেমন ধরো, তোমাদের মধ্যে কারোর নাম যদি মিতু হয়, আর আমি হঠাৎ তোমাকে প্রশ্ন করলাম 'তুমি কি মিতু?' দেখতো দু-দিক থেকেই একই প্রশ্নটা পাচ্ছো কিনা? রমাকান্ত কামারেরও অনেক বন্ধু আছে। অনেক অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। জানতে চাও তাদের নাম?
তবে শোনো,
ক) সদানন দাস
খ) নিধুরাম রাধুনি
গ) সুবল লাল বসু
ঘ) সুবর্ণা বসু
ঙ) সদাই দাস
চ) হারান রাহা

জেনে রাখার বিষয়:
বাংলা ভাষায় সব থেকে বড় প্যালিনড্রোম হল:
চেনা সে ছেলে বলেছে সে নাচে।

আজব ব্যাপার : ২

ইংরেজিতে সাবলীল কথা বলতে চাও? তাহলে জিভের জড়তা কাটাতে ইংরেজিতে এই বাক্যগুলি বারবার বলতে থাকো ঘুরতে-ফিরতে। দেখবে কতটা জিভ পরিস্কার হয়ে যায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে। আপাতত প্রথমবার পাঁচবার করেই বলো। দেখোতো পারো কিনা!

SHE SELLS SEASHELLS BY THE SEASHORE.
I SCREAM, YOU SCREAM, WE ALL SCREAM FOR ICECREAM.
I SAW A KITTEN EATING CHICKEN IN THE KITCHEN.
I WISH TO WASH MY IRISH WRIST WATCH.
THIN STICKS, THICK BRICKS.

আজব ব্যাপার : ৩

আচ্ছা, তোমরা কি কোন কাজ করবে বলে ফেলে রাখছো? রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে কাজটি করবে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে আর কাজটি করতে ইচ্ছা করছে না কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরিই হয়ে যাচ্ছে, কাজটি আর কোনভাবে করা হচ্ছে না।
তাই এটা শুনে নাও।

জেনে রাখার বিষয় :
অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, কোন কিছুকে তোমার অভ্যাসে পরিণত করতে হলে ৬৬ দিনই যথেষ্ট। কেউ যদি কোনো কাজ টানা ৬৬ দিন ধরে করে, তবে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। যেমন, সকালে ঘুম থেকে ওঠা, ব্যায়াম করা ইত্যাদি। কোন খারাপ অভ্যাস থেকে বের হতেও এটি প্রয়োজ্য।

আজব ব্যাপার: ৪

তোমরা এটা লক্ষ্য করেছ? মা যখন রান্নাঘরে পেঁয়াজ কাটে, তখন চোখ থেকে খুব জল বেরোতে থাকে। কেন এটা হয়? এই উত্তর খুঁজেছো কখনো? তাই শুনে নাও এটা।

জেনে রাখার বিষয় :
পেঁয়াজে রয়েছে সালফেনিক অ্যাসিড। কাটার পর সেগুলি বেরিয়ে আমাদের অন্য এনজাইমের সঙ্গে মিশে যায়। ব্যাস! তাতেই তৈরি হয় সালফার গ্যাস। এই গ্যাস চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা করে, জল বেরিয়ে যায়। এই কারণেই পেঁয়াজ কাটার অনেক পরেও হাতে গন্ধ লেগে থাকে।

আজব ব্যাপার : ৫

স্কুলে গিয়ে যখন তোমার বন্ধু তোমার পাশে বসে হাই তোলে, তখন নিজেরও একটা বড় দেখে হাই তোলার ইচ্ছে হয় বা তুলেই ফেলো ক্লাস চলাকালীন। কি তাইতো? কেন এমন হয় তোমরা জানো? হাই কি তাহলে ছোঁয়াচে? কেনই বা হাই ওঠে?

জেনে রাখার বিষয় :
বিজ্ঞানীদের মতে, এরকম হওয়ার কারণ মূলত শরীরে মিরর নিউরোনের উপস্থিতি। অর্থাৎ, যখন তুমি দেখো কেউ যখন কাউকে আঘাত করেছে, তখন তোমার শারীরিকভাবে ব্যথা অনুভব না হলেও মানসিকভাবে সেই অনুভূতি তোমার আসে, এবং আসা উচিত। মানুষ তো দলবদ্ধ জীব, তাই দল বেঁধে কাজ করতে মানুষ ভালোবাসে। তাই তোমার বন্ধুর দেখাদেখি তোমারও হাই ওঠে। এবার প্রশ্ন হাই ওঠে কেন? যখন তোমরা স্কুল থেকে ফেরো, পড়তে যাও বা পড়তে বসো তখন তোমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে। সেই সময় মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। হাই তুললে তখন মস্তিষ্কের তাপমাত্রা কমে যায়, এবং শরীরে অক্সিজেনের অভাবও দূর হয়। তখন মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে যায়।